আলোর নবী আল-আমীন

কাজী গোলাম আহ্মদ

দু'জনেই রাজী হলেন। তারপর একদিন তাঁকে নিয়ে আম্মা আমিনার কাছে হাজির হলেন। মা আমিনা তো অবাক। সে কী! এই সেদিন নিয়ে গেলে রাখবে বলে, আজ আবার বলছ রাখতে পারবে না। ব্যাপার কি?

বিবি হালিমা কি আর বলবেন? বললেন– আপনার ছেলের এখন বেশ জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে আর আমার লালন-পালন করার দায়িত্বও শেষ হয়েছে। আল্লাহ্ না করুন, এখন যদি হঠাৎ কিছু হয়, তখন সব দোষ তো আমার ঘাড়েই পড়বে। মা আমিনা তখন ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন– সত্যি করে বল তো কি হয়েছে?

বিবি হালিমা তখন বাধ্য হয়েই সব কথা খুলে বললেন। মা আমিনা বললেন– তোমার কি মনে হয়? আমার ছেলের ওপর কি কোন জিনের আছর আছে?

আমাদের তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। জবাব দিলেন বিবি হালিমা।

মা আমিনা বললেন– অসম্ভব। এ হতেই পারে না। আমার ছেলের শানই আলাদা। তার সাথে কারোরই তুলনা হয় না। কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারপর তিনি বিবি হালিমাকে শিশুর জন্মের আগে-পরে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল সব একে একে খুলে বললেন।

বিবি হালিমা বিস্ময়ে অবাক।

তোমরা হয়তো দেখেছ কিংবা শুনে থাকবে, আজকাল এমন অনেক ছেলে আছে, যারা বড় হয়ে বড় চাকরি পেয়ে বা সমাজের একটা কেউকেটা হলে বাপ-মায়ের কথা আর মনেই করে না। ছেলে সাত-মহলা বাড়িতে থাকে, কোর্মা পোলাও খায়, গাড়ি চড়ে বেড়ায়, দাস-দাসীর সেবা পায়। কিন্তু গ্রামের এক ভাঙা ঘরে হয়ত তার বুড়ো বাপ-মা দিন কাটাচ্ছে– অনাহারে বা আধপেটা খেয়ে। বিনা চিকিৎসায় অসুখে ভুগছে। ছেলের বাড়িতে এলে 'বাপ' বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। কিন্তু আমাদের নবীজী বড় হয়ে সারা আরবের শাহানশাহী পেয়েও তাঁর ছোটবেলার এই দাই-মাকে ভোলেন নি। একদিন সাহাবাদের নিয়ে যখন গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনায় ব্যস্ত, সেই সময় হঠাৎ নবীজীর নজরে পড়ল বিবি হালিমা আসছেন। দেখেই তিনি আলোচনা বন্ধ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। 'মা' 'মা' বলে ছুটে গেলেন কাছে। কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তা'জিম করে আগিয়ে নিয়ে এলেন। বসার জন্যে বিছিয়ে দিলেন নিজের গায়ের পবিত্র চাদর। দাই-মা তখন একেবারে বুড়ি থুথ্থুড়ে। এমন উপমা আর কারো জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

দাই-মা হযরত হালিমা, তাঁর স্বামী হযরত হারিছ এবং তাঁদের তিন ছেলে-মেয়ে আবদুল্লাহ্, শায়মা আর আনিসা এরা সবাই পরে ইসলাম ধর্ম কবুল করে ধন্য হয়েছিলেন।



দু'জনেই রাজী হলেন। তারপর একদিন তাঁকে নিয়ে আম্মা আমিনার কাছে হাজির হলেন। মা আমিনা তো অবাক। সে কী! এই সেদিন নিয়ে গেলে রাখবে বলে, আজ আবার বলছ রাখতে পারবে না। ব্যাপার কি ?

বিবি হালিমা কি আর বলবেন ? বললেন– আপনার ছেলের এখন বেশ জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে আর আমার লালন-পালন করার দায়িত্বও শেষ হয়েছে। আল্লাহ্ না করুন, এখন যদি হঠাৎ কিছু হয়, তখন সব দোষ তো আমার ঘাড়েই পড়বে। মা আমিনা তখন ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন– সত্যি করে বল তো কি হয়েছে ?

বিবি হালিমা তখন বাধ্য হয়েই সব কথা খুলে বললেন। মা আমিনা বললেন– তোমার কি মনে হয় ? আমার ছেলের ওপর কি কোন জিনের আছর আছে ?

আমাদের তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। জবাব দিলেন বিবি হালিমা।

মা আমিনা বললেন– অসম্ভব। এ হতেই পারে না। আমার ছেলের শানই আলাদা। তার সাথে কারোরই তুলনা হয় না। কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারপর তিনি বিবি হালিমাকে শিশুর জন্মের আগে-পরে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল সব একে একে খুলে বললেন।

বিবি হালিমা বিস্ময়ে অবাক।

তোমরা হয়তো দেখেছ কিংবা শুনে থাকবে, আজকাল এমন অনেক ছেলে আছে, যারা বড় হয়ে বড় চাকরি পেয়ে বা সমাজের একটা কেউকেটা হলে বাপ-মায়ের কথা আর মনেই করে না। ছেলে সাত-মহলা বাড়িতে থাকে, কোর্মা পোলাও খায়, গাড়ি চড়ে বেড়ায়, দাস-দাসীর সেবা পায়। কিন্তু গ্রামের এক ভাঙা ঘরে হয়ত তার বুড়ো বাপ-মা দিন কাটাচ্ছে– অনাহারে বা আধপেটা খেয়ে। বিনা চিকিৎসায় অসুখে ভুগছে। ছেলের বাড়িতে এলে 'বাপ' বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। কিন্তু আমাদের নবীজী বড় হয়ে সারা আরবের শাহানশাহী পেয়েও তাঁর ছোটবেলার এই দাই-মাকে ভোলেন নি। একদিন সাহাবাদের নিয়ে যখন গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনায় ব্যস্ত, সেই সময় হঠাৎ নবীজীর নজরে পড়ল বিবি হালিমা আসছেন। দেখেই তিনি আলোচনা বন্ধ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। 'মা' 'মা' বলে ছুটে গেলেন কাছে। কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তা'জিম করে আগিয়ে নিয়ে এলেন। বসার জন্যে বিছিয়ে দিলেন নিজের গায়ের পবিত্র চাদর। দাই-মা তখন একেবারে বুড়ি থুত্থুড়ে। এমন উপমা আর কারো জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে কি ?

দাই-মা হযরত হালিমা, তাঁর স্বামী হযরত হারিছ এবং তাঁদের তিন ছেলে-মেয়ে আবদুল্লাহ্, শায়মা আর আনিসা এরা সবাই পরে ইসলাম ধর্ম কবুল করে ধন্য হয়েছিলেন।



সাত



বুকের মানিক বুকে ফিরে পেয়েছেন মা আমিনা। শিশু-নবী ফিরে পেয়েছেন আপন মায়ের কোল। মিষ্টি-মধুর বোল তাঁর মুখে। উদার দৃষ্টি দুই চোখে। মায়ের কোলে বসে অবাক চোখে আকাশের তারা দেখেন, চাঁদ দেখেন আর শিশু মনে কত কি যেন ভাবেন। তারায় তারায় কাকে যেন খোঁজেন। দিন যায়, রাত আসে। রাত যায়, দিন আসে। মাস যায়, বছর আসে। শিশু-নবী বড় হন, আরো একটু বড়। ছ'বছরে পা দেন। মা আমিনার ইচ্ছা হয় একবার মদীনা থেকে ঘুরে আসেন। মক্কা থেকে অনেক দূর। সেখানে তাঁর আব্বার কবর। মা আমিনার মন ছটফট করে তাঁর কবর যিয়ারত করার জন্যে। ছেলেকে নিয়ে একদিন তিনি রওনা হলেন মদীনার পথে। সঙ্গে নিলেন ধাত্রী উম্মে আয়মানকে।

নানাজী নাই কিন্তু মায়ের অন্যান্য রিশ্‌তাদার, আত্মীয়-কুটুম আছে। মা আমিনা সেখানে মাস খানেক কাটালেন। তারপর হযরত আবদুল্লাহ্‌র কবর যিয়ারত করে আবার মক্কার পথে রওনা হলেন। মাঝপথে 'আব্‌ওয়া' নামক জায়গায় এসে হঠাৎ তিনি অসুখে পড়লেন। সঙ্গে শিশু-নবী আর ধাত্রী উম্মে আয়মান। অসুস্থ আম্মার মাথার কাছে শিশু-নবী মলিন মুখে বসে থাকেন। কখন আম্মা ভালো হয়ে উঠবেন। আবার তাদের যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অন্যরূপ। মা আমিনার অসুখ আরো বেড়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, এবার তাঁর স্নেহের দুলালকে ছেড়ে তাঁকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। পিতৃহারা পুত্রকে ছেড়ে যেতে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল। করুণ চোখে তিনি চেয়ে ছিলেন শিশুর অসহায় মুখের দিকে। শিশু চেয়েছিলেন মৃত্যুকাতর মায়ের মুখের দিকে। আহা! কি করুণ দৃশ্য। দু'জনের চোখেই পানির ধারা।

সহসা এক সময় আম্মা আমিনা চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। বুকের মানিককে পথে ফেলে তিনি চলে গেলেন। শিশু-নবী মায়ের বুকের ওপর পড়ে 'মা' 'মা' বলে কাঁদছেন। কিন্তু কই ? আম্মা তো আর সাড়া দেন না ! এরই নাম কি মৃত্যু ?

নবী-জননীকে সেখানেই দাফন করা হলো। এবার তিনি পুরোপুরি এতিম হলেন। আব্বাও নেই। আম্মাও নেই। আল্লাহ্‌র কি খেলা। যার আব্বা নেই, আম্মা নেই, তার যে কি ব্যথা নবীজী ছোটবেলায় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এইজন্যে বড় হয়ে তিনি কখনো এতিমদের কথা ভোলেন নি। সবার আগে এতিমের হক আদায় করার, এতিমকে কষ্ট না দেয়ার জন্যে বারবার আমাদের তাগিদ দিয়ে গেছেন।

উম্মে আয়মান চোখের পানি মুছে শিশুকে তুলে দিলেন দাদা আবদুল মুত্তালিবের হাতে। আবদুল মুত্তালিব তখন একেবারেই বুড়ো, জইফ হয়ে গেছেন। বিরাশি বছর বয়স। প্রিয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে হারিয়ে তাঁর বুক আগেই ভেঙে গিয়েছিল। এবার পুত্রবধুর ইন্তিকালে তিনি শোকে আরো মুষ্‌ড়ে পড়লেন। শিশু-নবীকে বুকে তুলে নিলেন। চোখের মণির মত তাঁকে আগ্‌লে রইলেন। কিন্তু ক'দিন আর রাখবেন? পরপারের ডাক তো সব সময় তাঁর কানে বাজছে। তিনি তাঁর পুত্র আবূ তালিবকে ডেকে ধরগলায় বললেন– 'বাবা! কোন্‌দিন আমি চলে যাবো তার ঠিক নেই। শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে তাই আমি আগে থেকেই তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ্ এর নেগাহবান রইল। কিন্তু সাবধান! এর আদর-যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়। নিজের সন্তানের মতই একে চোখে চোখে রাখবে।

বছর দুই পর। নবীজীর বয়স যখন আট, তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। শিশু-নবী এবার শোকে আছ্‌ড়ে পড়লেন। আবদুল মুত্তালিবের জানাজা নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। চলার পথের উটগুলো যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো। গাছের পাখিগুলো তাদের কিচির-মিচির শব্দ বন্ধ করল। আহা! এমন নসীবও কারো হয়!

আবূ তালিব ছিলেন হযরতের আপন চাচা। তিনি আব্বার উপদেশ একটুও ভোলেন নি। নিজের ছেলেদের চেয়েও আমাদের নবীকে বেশি ভালোবাসতেন। সব সময় কাছে কাছে রাখতেন। যেখানেই যেতেন, সেখানেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। চাচার আদরে শিশু-নবী আম্মার শোক, দাদার শোক অনেকটা ভুলে গেলেন। চাচার বাড়িতে চাচার স্নেহ-যত্নে তিনি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন।

আমাদের দেশে যারা গরু-ছাগল চরায়, তাদের বলে রাখাল। এ কাজটাকে সবাই ঘেন্নার চোখে দেখে। তাই না? লেখা-পড়া মন দিয়ে না করলে আমরা ছেলেদেরকে কি বলি জান তো? বলি, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। বড় হলে গরু চরিয়ে খেতে হবে। তার মানে,– রাখাল হতে হবে। আরবদেশে তখন কিন্তু এটা কোন দোষের বা ছোট কাজ ছিল না। তারা এটাকে গৌরবের কাজ বলে মনে করত। অবশ্য দুনিয়ার কোন কাজই ছোট নয়। নিজের কাজ নিজে করায় নিন্দার কিছু নেই বরং সেটা আরো গৌরবের। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো। কেউ একটু বড় হলেই তার মান বেড়ে যায়। ছোট একটা হাত ব্যাগ বইবার জন্যেও চাকর বা কুলির দরকার হয়। কিন্তু আমাদের নবী কি না করতেন? দশ বছর যখন বয়স, তখন তিনি ছাগল, বক্‌রী, ভেড়া চরিয়েছেন। বড় হয়ে পবিত্র মাথায় বোঝা নিয়েছেন। কাঠ কেটেছেন। অসুস্থ অতিথির মল-মূত্র পরিষ্কার করেছেন। তাইতো তিনি রাখাল নবী, দয়ার নবী, মানুষের নবী, বিশ্ব নবী।

নবীর বয়স যখন বার, তখন চাচা আবূ তালিব বাণিজ্য করার জন্যে সিরিয়ায় রওনা হবেন বলে তৈরি হলেন। সিরিয়াকে তখন 'শামদেশ' বলত।

কুরাইশরা সবাই ছিলেন ব্যবসায়ী। বছরে দু'বার তাঁরা বিদেশে ব্যবসায়ের জন্যে বের হতেন। একবার গ্রীষ্মকালে আর একবার শীতের মৌসুম এলে। আর সে সফর ছিল ভীষণ কষ্টদায়ক। পথে চোর-ডাকাতের ভয় তো ছিলই, তাছাড়া যাতায়াতের জন্যে উট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কারণ আজকালকার মত রেলগাড়ি, মোটর-বাস কিংবা উড়োজাহাজের প্রচলন তখন হয়নি। একদিনের পথ একমাস লাগত। সেজন্যে একা কেউ কোন সফরে বের হতো না। বিশ-ত্রিশজন বা তারও বেশি লোক একত্র হয়ে তবে বের হতো। এদের এই দলকে বলা হতো কাফেলা।

জোগাড়-যন্তর সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে। চাচা আবূ তালিবের কাফেলা এবার যাত্রা শুরু করবে। হঠাৎ কিশোর নবী দৌড়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন।

'চাচাজান'। আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন ? আপনি ছাড়া আর কে আছে আমার ? আমি কার কাছে থাকব ? আমার আব্বা নেই, আম্মা নেই, আমি যে একেবারে একা। আপনাকে ছেড়ে কি করে আমি থাকব ?

কিশোর নবীর কান্নায় আবূ তালিব কেঁদে ফেললেন। কিশোর নবীর কথাগুলো কাঁটার মত তাঁর বুকে গিয়ে যেন বিঁধে গেল। ধরলেন তিনি ভাইপোকে। চোখের পানি মাথার পাগড়ির প্রান্তে মুছিয়ে বললেন–

তুমি আমাকে ছাড়া যেমন থাকতে পার না– আমিও তেমনি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না, বাবা! যত কষ্টই হোক, তোমাকে নিশ্চয়ই আমি সাথে নিয়ে যাব।

আনন্দে কিশোর নবীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভুলে গেলেন সব ব্যথা আর বেদনা। কিশোর নবীর কাফেলা এগিয়ে চল্‌ল মরুর বালু উড়িয়ে, একের পর এক পাহাড় পেরিয়ে সিরিয়ার পথে। পথে কত রঙ-বেরঙের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি-কৌশল কিশোর নবী অবাক বিস্ময়ে দেখেন। থম্‌কে দাঁড়ান আর পথ চলেন।

পথের মাঝে পড়ল 'বস্‌রা' শহর। সেখানে ছিল খৃস্টানদের এক গির্জা। সেই গির্জার কাছে এক গাছের তলায় আবূ তালিবের কাফেলা এসে থামল। এবার বিশ্রাম। অনেক পথ তাঁরা পার হয়ে এসেছেন। উটের পিঠ থেকে সবাই নামলেন। গাছের শীতল ছায়ায় বসলেন।

গির্জার পাদরীর নাম ছিল 'বুহায়রা'। তিনি গির্জার উপরে যখন দাঁড়িয়েছিলেন, তখন দেখেছিলেন– এই কাফেলার আগে আগে যে কিশোরটি আসছেন তার মাথার উপর একখণ্ড মেঘ। কাফেলার সাথে সাথে মেঘটি ছায়া দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কাফেলার কিশোরটি তো যে সে নয়। এঁর পরিচয় জানা দরকার। কাফেলাকে গির্জার কাছে থামতে দেখেই তিনি নেমে এলেন। মেঘের দিকে আর একবার তাকালেন। দেখলেন, এবার মেঘ নয়। একটা গাছ তার ডালপালা সব একত্র করে ছাতার মত নুয়ে পড়ে ছায়া দিচ্ছে। আজব ব্যাপার! এসব কথা তাদের কাউকে কিছু বললেন না। কেবল বললেন, আপনারা দূর থেকে

আসছেন। খুবই ক্লান্ত। যদি মেহেরবানী করে আপনারা সবাই আমার এখানে আজ খাওয়া-দাওয়া করেন, তা হলে আমি খুবই খুশি হব।

এই দাওয়াত কাফেলার সবাই গ্রহণ করল। কিন্তু যাওয়ার সময় তাঁরা আমাদের কিশোর নবীকে রেখে গেল। মনে করল ছেলে-মানুষ, বয়সে ছোট। বড়দের মজলিসে না নেওয়াই ভাল। কিন্তু 'বুহায়রা' তাঁকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন– আপনাদের দলের সবাই এসেছেন তো ? আমার কিন্তু ইচ্ছা, কেউ যেন এই দাওয়াতে বাদ না পড়ে।

সবাই লজ্জা পেল একটু। তখনি একজন গিয়ে কিশোর নবীকে ডেকে নিয়ে এল। পাদ্রী কিন্তু বিরাট এক খানার আয়োজন করে ফেলেছিল। পথের মাঝে এমন উপাদেয় খানা ক'জনের বরাতে জোটে ? সবাই খাওয়া-দাওয়ায় মশ্‌গুল। বুহায়রা হাসিমুখে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন। কি দেখছেন ? তিনি দেখছেন আমাদের কিশোর নবীকে। তার চোখ-মুখ, নাক-কান। তাঁর বসার কায়দা। খাওয়ার কায়দা। মনে মনে বুহায়রা নিজেকেই যেন বললেন 'হ্যাঁ'! এই তো সেই। মসিহ্‌-বিন্‌-মরিয়ম ইঞ্জিল কিতাবে তো এঁরই কথা বলে গেছেন। তবু, মনের সন্দেহ ঘোচে কই ? চেহারাটাই তো সব নয়। এর সাথে আলাপ করা দরকার। এর নাম, বংশ পরিচয়, আব্বা-আম্মার কথাও তো জানা দরকার। সব কিছু মিললেই তবে না বুঝব, 'ইনি সেই শেষ নবী।'

খাওয়া-দাওয়ার পর বুহায়রা বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব। লাত্‌ আর উজ্জার নামে কসম খেয়ে আপনাদের এই ছেলেটিকে তার জবাব দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কিশোর নবী প্রতিবাদ জানালেন। বললেন,– লাত্‌ আর উজ্জার নামে আমি কসম খাবো না।

–কেন কসম খাবে না ? কুরাইশরা সবাই তো লাত্‌-উজ্জার কসম খায়।

–আমি খাই না। লাত্‌-উজ্জাকে আমি ঘৃণা করি। এত ঘৃণা আর অন্য কোন জিনিসকে করি না। পাদ্‌রী বুহায়রার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ঠিকই মিলে যাচ্ছে। আচ্ছা,– তাহলে আমার কথার জবাব দাও। তুমি কতক্ষণ ঘুমাও ? ঘুমিয়ে কি ধরনের স্বপ্ন দেখ ?– কি ধরনের কাজ করতে ভাল লাগে ? কোন্‌গুলো ভাল লাগে না ? ইত্যাদি নানান্‌ প্রশ্ন। নবীজী জওয়াব দিয়ে যান। সবশেষে হঠাৎ তিনি নবীজীর দুই কাঁধের মাঝখানটা দেখতে চাইলেন। তা'ও দেখালেন–

কিশোর নবীর দস্ত চুমি 'বুহায়রা কয়' এইতো সেই–

শেষের নবী, বিশ্ব নিখিল ঘুরছে যাঁহার উদ্দেশ্যেই।

আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন বুহায়রা। মনে মনে বলে উঠলেন– এইতো সেই– এইতো সেই। হায়! আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকতাম।

আবূ তালিবকে জিজ্ঞেস করলেন,– ছেলেটি আপনার কে হয় ?

আবূ তালিব জবাব দিলেন,– কে আবার ? আমার ছেলে।

অসম্ভব। এ ছেলের আব্বা বেঁচে থাকতেই পারে না। সত্যি করে বলুন– ছেলেটি আপনার কে হয় ?

পাদরীর কথায় আবূ তালিব অবাক। আশ্চর্য! পাদ্‌রী তার কথায় এত জোর পেল কী করে ? শেষে সত্যি কথাই বললেন।

–আমার ভাইপো।

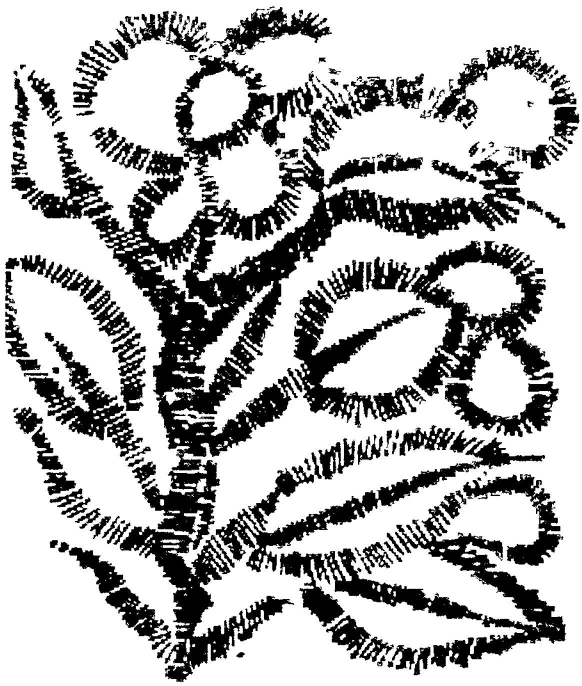
–এর আব্বা তা হলে কোথায় ?

–এর জন্মের কিছু আগে তিনি ইন্তিকাল করেছেন।

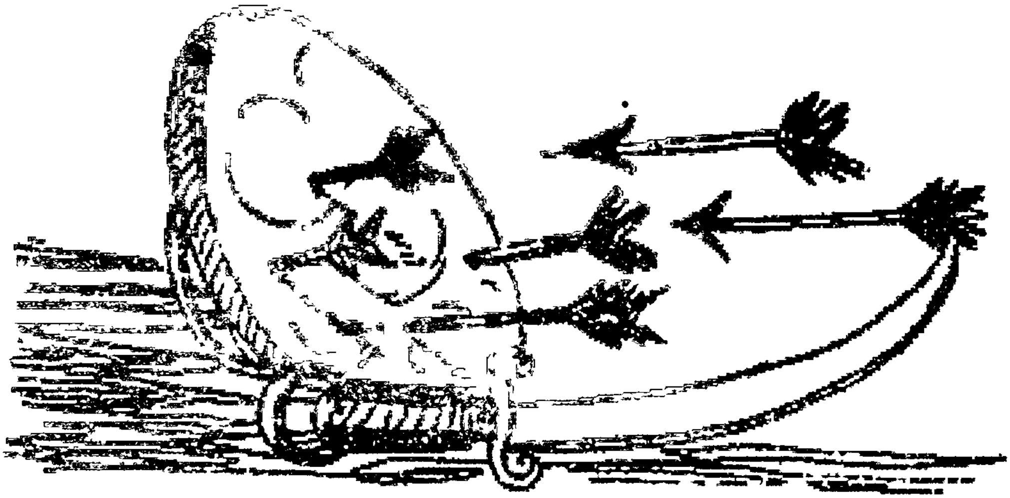
বুহায়রা বলল– এবার সঠিক উত্তর আমি পেয়েছি।

আবূ তালিবকে আড়ালে ডেকে নিলেন পাদরী বুহায়রা। বললেন,– এই ছেলেই একদিন সারা আরবের গৌরব-রবি হবে। এঁর পরশে সারা আরব পাপের অন্ধকার থেকে মুক্ত হবে। আরবে পুতুল পূজার অবসান হবে। সাবধান! একে খুব সাবধানে রাখবেন। ইহুদীরা এঁর সবচেয়ে বড় দুশ্‌মন। জান্‌তে পারলেই ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। আমি অনুরোধ করছি আপনি ঘরে ফিরে যান। আর কোথাও একে নিয়ে যাবেন না।

পাদরীর কথায় বিশ্বাস হলো চাচা আবূ তালিবের। তিনিও অনেক আলামত পেয়েছেন আর দেরি না করে, যথা সত্বর নিজের কাজ সেরে, তিনি আবার মক্কায় ফিরে গেলেন।



আট

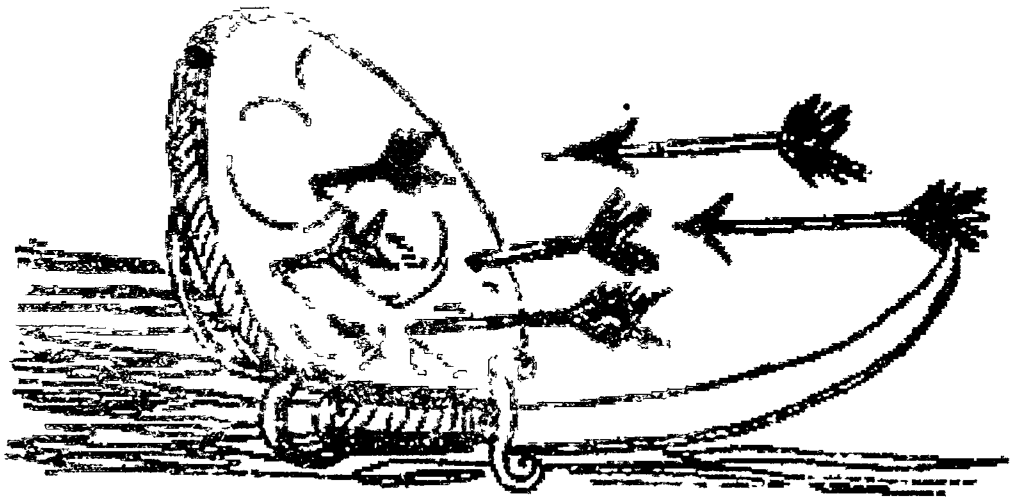


আবার দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। নবীজী আরো একটু বড় হলেন। চৌদ্দ বছরে পা দিলেন। হঠাৎ মক্কার কুরাইশ ও কায়স এই দুই বংশের মধ্যে কোন একটা ব্যাপার নিয়ে লড়াই বেধে গেল। আগেই বলেছি– এ রকমটি প্রায়ই হতো। আর লড়াই একবার শুরু হলে তার জের চলত বহুদিন ধরে। দুই বংশের লোকেরাই তৈরি হলো। নিজেদের সেনাদল আগিয়ে দিল।

কিশোর নবীও চাচা আবূ তালিবের সাথে এই লড়াইয়ে শরীক হলেন। কিশোর নবী হলেন কিশোর সেনা। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। তবে এই লড়াইয়ে তিনি কাউকে একটিও আঘাত করেন নি। শুধু দুশ্‌মনরা তাঁর চাচা আবূ তালিবকে লক্ষ করে যে তীর ছুঁড়েছিল তিনি সেই তীর ঠেকিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। এমন বাহাদুরি এমন সাহস ক'জন ছেলে দেখাতে পারে– বলতো? চারদিন পর্যন্ত এই লড়াই চলে। শেষে কুরাইশরা যখন জয়লাভ করে, তখন দুই দলে একটা মিট্‌মাট হয়ে যায়। এই যুদ্ধকে বলা হয় 'ফেজারের শেষ যুদ্ধ'। এর আগে 'ফেজারে' আরো তিনটি যুদ্ধ হয়েছিল।

ফেজার লড়াই যখন শেষ হলো, তখন মক্কার সব বংশের লোকেরা একত্র হয়ে একদিন একটি আলোচনা সভায় বসল। যাতে করে ভবিষ্যতে আর এমনটি না হয়। নবীজীও সেখানে হাজির ছিলেন। এটা হয়েছিল 'আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-জুদয়ানের বাড়িতে বসে। নবীজীর প্রস্তাব মাফিক সবাই একমত হয়ে, শান্তি রক্ষার জন্যে–মিলেমিশে থাকার জন্যে, একটা 'একরার নামা' বা অংগীকারপত্রে স্বাক্ষর দিল। তাতে শর্ত ছিল এই যে,– মক্কার বাসিন্দা যারা, তাদের ওপর অথবা বাইরে থেকে মক্কায় যারা মেহমান হয়ে আসবে তাদের ওপর কাউকে আমরা জুলুম করতে দেব না। আমরাও কেউ কারো ওপর জুলুম করব না। যারা জুলুমবাজ, যারা অত্যাচারী, তাদেরকে আমরা কঠোর হাতে দমন করব। ঝগড়া-বিবাদ থেকে আমরা সবাই দূরে থাকব।

আট



আবার দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। নবীজী আরো একটু বড় হলেন। চৌদ্দ বছরে পা দিলেন। হঠাৎ মক্কার কুরাইশ ও কায়স এই দুই বংশের মধ্যে কোন একটা ব্যাপার নিয়ে লড়াই বেধে গেল। আগেই বলেছি- এ রকমটি প্রায়ই হতো। আর লড়াই একবার শুরু হলে তার জের চলত বহুদিন ধরে। দুই বংশের লোকেরাই তৈরি হলো। নিজেদের সেনাদল আগিয়ে দিল।

কিশোর নবীও চাচা আবূ তালিবের সাথে এই লড়াইয়ে শরীক হলেন। কিশোর নবী হলেন কিশোর সেনা। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। তবে এই লড়াইয়ে তিনি কাউকে একটিও আঘাত করেন নি। শুধু দুশ্‌মনরা তাঁর চাচা আবূ তালিবকে লক্ষ করে যে তীর ছুঁড়েছিল তিনি সেই তীর ঠেকিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। এমন বাহাদুরি এমন সাহস ক'জন ছেলে দেখাতে পারে- বলতো ? চারদিন পর্যন্ত এই লড়াই চলে। শেষে কুরাইশরা যখন জয়লাভ করে, তখন দুই দলে একটা মিট্‌মাট হয়ে যায়। এই যুদ্ধকে বলা হয় 'ফেজারের শেষ যুদ্ধ'। এর আগে 'ফেজারে' আরো তিনটি যুদ্ধ হয়েছিল।

ফেজার লড়াই যখন শেষ হলো, তখন মক্কার সব বংশের লোকেরা একত্র হয়ে একদিন একটি আলোচনা সভায় বসল। যাতে করে ভবিষ্যতে আর এমনটি না হয়। নবীজীও সেখানে হাজির ছিলেন। এটা হয়েছিল 'আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-জুদয়ানের বাড়িতে বসে। নবীজীর প্রস্তাব মাফিক সবাই একমত হয়ে, শান্তি রক্ষার জন্যে-মিলেমিশে থাকার জন্যে, একটা 'একরার নামা' বা অংগীকারপত্রে স্বাক্ষর দিল। তাতে শর্ত ছিল এই যে,- মক্কার বাসিন্দা যারা, তাদের ওপর অথবা বাইরে থেকে মক্কায় যারা মেহমান হয়ে আসবে তাদের ওপর কাউকে আমরা জুলুম করতে দেব না। আমরাও কেউ কারো ওপর জুলুম করব না। যারা জুলুমবাজ, যারা অত্যাচারী, তাদেরকে আমরা কঠোর হাতে দমন করব। ঝগড়া-বিবাদ থেকে আমরা সবাই দূরে থাকব।

যাঁরা মজলুম– যাদের ওপর অত্যাচার করা হবে তাদেরকে আমরা সব সময় রক্ষা করব এবং তার প্রতিশোধ নেব। দেশ থেকে খারাপ কাজ দূর করব। খারাপ কাজ কাউকে করতে দেখলেই বাধা দেব। সব সময় আমরা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকব। এতিম, বিধবা ও মিসকিনদের যত্ন নেব। নিঃস্ব ও বেকার লোকদের কাজ জোগাড় করে দেব।

এই একরার-নামাকেই বলা হয় 'হিলফুল ফজুল'। এই 'হিলফুল ফজুল' সমিতির আসল প্রতিষ্ঠাতাই হচ্ছেন আমাদের নবীজী। দুনিয়ার প্রথম 'শান্তি সমিতি'—তিনিই ছিলেন এই দলের পরিচালক। এতে চারজন সদস্য ছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে– ফজল, ফাজেল, মুফাজ্জল ও ফাজায়েল। কেউ কেউ বলেন, এই চারজনের নাম অনুসারেই এই সমিতির নাম রাখা হয়। সে যাই হোক. এই সমিতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শান্তি প্রতিষ্ঠায় মক্কায় সুনাম কিনে ফেলল। আর ঝগড়া-বিবাদ নেই, মারামারি নেই, বাইরের লোকেরা মক্কায় এসে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে। কারো কোন নালিশ নেই। থাকলে সালিস বসে। আপোসে মিটমাট হয়ে যায়। শান্তি-সমিতি 'হিলফুল ফজুল'-এর সদস্যরা দুষ্কৃতিকারীদের চোখে চোখে রাখে। রাত বিরাতে পাহারা দেয়। কিশোর নবীর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বুদ্ধি, তাঁর বিচার, তাঁর সত্যবাদিতায় সবাই মুগ্ধ হয়। সবাই তাঁর তারিফ করে।

মক্কার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এই কিশোর নেতা– শান্তি সেনা, সত্য সেনা মুহাম্মদ (সা)-এর নাম। বড়রাও তাঁর কথা শোনে। তাঁকে বিশ্বাস করে, তাঁকে মানে। এমন কি যারা তাঁকে পছন্দ করে না– এসব কাজ যাদের কাছে ভাল লাগে না, যারা দুষ্কৃতিকারী, তাঁরাও কিন্তু একটি বিষয়ে একমত যে– মুহাম্মদ (সা) মিথ্যা বলে না। যখন যা বলে সত্য কথাই বলে। কখনও কেউ তাঁকে মিথ্যা বলতে শোনেনি। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে শোনেনি। কেউ কিছু জমা রাখলে হুবহু সেই জিনিসই তেমনিভাবে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সে যে দলের, যে বংশের, যে মতেরই হোক।

সবাই দেখে– দুশ্‌মন যদি ন্যায় কাজ করে– ন্যায় কথা বলে তিনি তাকে মেনে নেন। অন্যদিকে আপনজন কিংবা তাঁর কোন দোস্তও যদি অন্যায় করে কিংবা অন্যায় কথা বলে, তিনি তাকে বাধা দেন। তার পক্ষে সায় দেন না। সব সময় তিনি হক কথা বলেন। হক পথে চলেন। এজন্যে মক্কার লোকেরা খুশি হয়ে তাঁকে এক নতুন উপাধি দিল– 'আল-আমীন'। যার মানে হচ্ছে বিশ্বাসী। শেষে এমন হলো যে, মুহাম্মদ (সা)-এর নাম বললে অনেকেই চিনত না। কিন্তু 'আল-আমীন' বললেই সবাই চিনত। তাই এরপর থেকে সবাই তাঁকে 'আল-আমীন' বলেই ডাক্‌তো। কেউ কেউ বলত– 'আস-সাদিক' অর্থাৎ 'সত্যবাদী'। তাই তো আমরা আজো অন্যায়ের-অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তাঁকে ডাকি। বলি ঃ

সত্যের রাহাগীর! কোথা হে সদরুল আমীন
ফিরে এসে ভেঙে দাও পাথর কঠিন সব দিন।

কিশোর নবী এমনিভাবে সমাজ-সেবায়, মানুষের সেবায়, শান্তির কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সবার ভক্তি ভালোবাসার মাঝে বড় হতে লাগলেন। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম। তাঁর শান্তি-সমিতি 'হিলফুল ফজুলের' নাম। তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সাহসিকতা আর আমানতদারীর নাম।

নয়



কিশোর নবী যৌবনে পা দিলেন। ইয়েমেন দেশে বাণিজ্য-যাত্রায় ইতিমধ্যেই তিনি ব্যবসায়ী মহলে সুনাম কিনেছেন। তাঁর সততার খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন আদর্শ ব্যবসায়ী বিরল। কথাটা লোকের মুখে মুখে বিবি খাদিজার কানে গিয়ে পৌঁছল। বিবি খাদিজা ছিলেন একদিকে মক্কার সবচেয়ে ধনবতী, অন্যদিকে উচ্চ বংশীয়া মহিলা। শুধু তাই-ই নয়, তার মনটাও ছিল খুব উঁচু, উদার আর কোমল। দান-খয়রাতেও তাঁর সুনাম ছিল। তখনকার দিনে মক্কায় তাঁর মত গুণবতী, রূপবতী আর চরিত্রবতী রমণী ছিল না বললেই চলে। তিনি ছিলেন বিধবা। স্বামী ছিলেন ব্যবসায়ী। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যবসায় দেখাশুনা করার মত আর কেউ ছিল না। যুবক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশংসা শুনে বিবি খাদিজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর হাতে ব্যবসায়ের ভার ছেড়ে দিতে চাইলেন। হযরত এ ব্যাপারে চাচার সাথে পরামর্শ করলেন। খুশির সাথেই মত দিলেন তিনি। তারপর হযরত বিবি খাদিজাকে জানালেন যে, তাঁর আপত্তি নেই। বিবি খাদিজা অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাঁকে মাল-মাত্তা দিয়ে শামদেশে বাণিজ্যের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। সাথী হিসাবে সাহায্য করার জন্যে সঙ্গে দিলেন তাঁর ক্রীতদাস মাইসারাকে।

শাম দেশে পৌঁছে তাঁরা বিশ্রামের জন্যে একটা গাছের নিচে যখন বসেছিলেন তখন নিকটবর্তী গির্জার পাদরী নস্তুরা তাদেরকে লক্ষ করছিলেন। মাইসারাকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন। নসতুরা মাইসারাকে কাছে ডেকে হযরতের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। মাইসারা বলল—ইনি হেরেমের বাসিন্দা এবং কুরাইশ বংশের সবচেয়ে শরীফ খান্দানের লোক। পাদরী পুনরায় প্রশ্ন করল– আচ্ছা ওঁর চোখে কি লাল রঙের কোন আভা আছে?

–হ্যাঁ। সব সময়ই তো দেখতে পাওয়া যায়।

–তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই যে,– ইনিই সেই শেষ নবী। এ সব নবুওত লাভেরই চিহ্ন। কিন্তু হায়! ততদিন হয় তো আমি আর এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকব না।

এবারে ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হয়েছে। এমনটি আর কখনো হয়নি। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কেনা হয়ে গেছে। এবার দেশে ফেরার পালা। পথের মাঝে অসহ্য গরম, কাঠফাটা রোদ। মাইসারা সহসা দেখতে পেল, হযরতের মাথায় রোদের লেশমাত্র নেই। কি আশ্চর্য! বৃক্ষ-লতাহীন মরুপথে ছায়া এলো কোথা থেকে ? চেয়ে দেখে, হযরতের উটের সাথে সাথে শূন্যে কা'রা যেন ছায়াদান করে চলেছে। অবাক! মাইসারা অবাক! তার কানে বাজে পাদরী নসতুরার কথা।

–তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই যে, ইনিই সেই শেষ নবী। এসব নবুওত লাভেরই চিহ্ন।

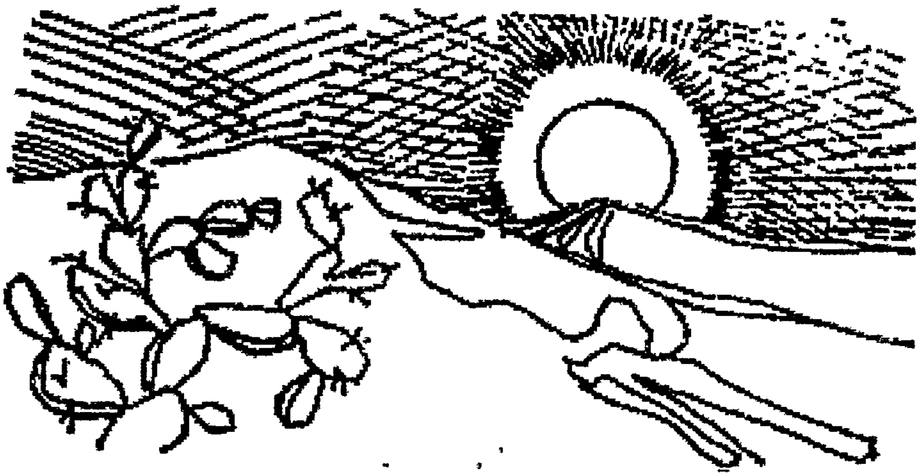
মক্কায় ফিরে মাইসারা বিবি খাদিজার কাছে সব ঘটনা খুলে বলল। বিবি খাদিজা তখুনি অরাকা-বিন্-নওফেলকে ঘটনাটা জানালেন। অরাকা ছিলেন ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি শুনে বললেন, ঘটনাটা যদি সত্যি হয় তাহলে নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই শেষ নবী। বিবি খাদিজাও জানতেন শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। হযরতের চাল-চলনে, কথা-বার্তায়, কার্য-কলাপে তাঁর আগে থেকেই এ রকম একটা বিশ্বাস মনে জেগেছিল। এবার তা আরো দৃঢ় হলো। হযরতের প্রতি তাঁর ভক্তি আরো বেড়ে গেল।

এই ঘটনার তিন মাস পর বিবি খাদিজা হযরতের কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। তখনকার দিনে মক্কার মেয়েরা নিজেদের বিয়ের প্রস্তাব নিজেই পাঠাতে পারতো। হযরতের চাচা আবূ তালিব এই প্রস্তাবে খুশি হলেন। তারপর তিনি নিজেই বিবি খাদিজার বাড়িতে হাজির হয়ে বিয়েতে খোতবা পড়ালেন। এই সময় হযরতের বয়স ছিল পঁচিশ।

হযরত খাদিজা (রা) ছিলেন নবীজীর প্রথম পত্নী। নবী কন্যা খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতিমা (রা)-এর আম্মা। হযরত খাদিজা (রা) ছিলেন দুনিয়ার প্রথম মুসলমান। তাঁর আগে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেন নি।



দশ



আগেই বলেছি নবীজী ছোটবেলা থেকেই ভাবুক ছিলেন। সর্বদাই কি যেন ভাবতেন। যৌবনে এসেও অবসর পেলেই নির্জনে বসে থাকতেন। কখনও পাহাড়ের উপর বসে নিচের সবুজ বনানীর পানে চেয়ে থাকতেন। কখনও সুদূর নীল আকাশের দিকে। রাতের বেলা চাঁদের আলোয় তারায় তারায় কি যেন খুঁজে বেড়াতেন। পাহাড়ী ঝর্ণায়, পাখ-পাখালীর গানে, নদীর কলতানে কা'র যেন সুর শুনতেন। মেঘের আনাগোনায় কাকে যেন দেখতে চাইতেন। ভোরের সূর্যোদয়, সন্ধ্যার অস্তমিত লাল সূর্য ভাবিয়ে তুলতো তাঁকে। ভাবিয়ে তুলতো সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে। ভাবতেন, এ সবের স্রষ্টা কে ? কা'র নির্দেশে এরা আসে, যায়। নিয়ম বেঁধে চলে ? কে সে মহান ? কে সে শক্তিধর ? কেমন তাঁর রূপ ? কোথায় তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ? কে দেবে তাঁকে সেই পথের–সেই অদেখার সন্ধান। ভাবনার শেষ নেই! ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা হয়। কখনো বা রাত ভোর হয়ে যায়।

এই সময়কার আর একটি ঘটনার কথা বলি। হযরতের উপস্থিত বুদ্ধির ফলে যে ঘটনা কুরাইশদের মধ্যে আর একটি যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনার কথা।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফের দেয়াল গেঁথেছিলেন, সেই পাথরটাকে বলা হয় 'হাজরে আস্‌ওয়াদ' বা কৃষ্ণ পাথর। এই পাথরটা হযরত ইবরাহীমের স্মৃতিবাহী। এই পাথর সকলের কাছে পবিত্র। সকলের কাছে প্রিয়। সবাই একে স্পর্শ করে ধন্য হয়। ঘটনাটা ঘটেছিল এই পাথরকে কেন্দ্র করেই।

কাবাঘরের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। ভেতরে ছিল একটা গর্ত। সেই গর্তেই ভক্তরা ছুঁড়ে ফেলে দিত তাদের যত নজরানা অর্থাৎ মানত করা জিনিস-পত্তর। মানুষ-সমান উঁচু দেয়ালঘেরা এই ঘরের কোন ছাদ ছিল না। ফলে, একদিন মূল্যবান জিনিস-পত্তর সব চুরি হয়ে গেল। তা'ছাড়া ঘরটা নিচু জায়গায় হওয়ায় সব সময় পানি জমে থাকত। সেই পানি বসে গিয়ে বার বার ঘরের ক্ষতি করত। এর উপর একদিন সবাই দেখতে পেল প্রকাণ্ড একটা সাপ এসে আশ্রয় নিয়েছে সেই ঘরে। ধারেকাছে আর কাউকে সে ঘেঁষতে দেয় না। সবাই আল্লাহ্‌র কাছে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার

জন্যে ফরিয়াদ জানাল। আল্লাহ্ শুনলেন সে ফরিয়াদ। একদিন সবাই দেখল সাপটা যখন রৌদ্রে গা শুকাচ্ছে ঠিক সেই সময় কোথা থেকে একটা বিরাট পাখি এসে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। সবাই এটাকে শুভ-সূচনা মনে করল। ঠিক করল আর দেরি না করে এবার কাবাঘরকে নতুন করে তৈরি করতে হবে। শুরু হয়ে গেল সাথে সাথে সংস্কারের কাজ। পবিত্র ঘরের পুনর্গঠনে এগিয়ে এলো সকল গোত্রের লোক। দেখতে দেখতে কাজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু গোল বাধল 'হাজরে আসওয়াদ' বা কৃষ্ণ পাথরকে নতুন করে স্থাপন করা নিয়ে। প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেকেই চায় এই পবিত্র পাথরকে তারাই স্থাপন করবে। শেষে বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছাল। আবার একটা যুদ্ধ বাধে আর কি! তিন-চার দিনেও কোন মীমাংসা হলো না। শেষে কুরাইশদের মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যক্তি আবূ উমাইয়া-বিন-মুগীরা বললেন,—ঠিক আছে ঝগড়া-বিবাদে কাজ নেই। আমার একটা শেষ প্রস্তাব আছে,– যদি আপনারা গ্রহণ করেন, তাহলে বলি। সবাই শুনতে চাইলে তিনি বললেন–

আগামীকাল ভোরে সবার আগে যিনি কাবাঘরে আসবেন, তাঁকেই সালিস নিযুক্ত করা হবে এবং তিনি যা বিচার করে দেবেন সকলকেই তা মেনে নিতে হবে। এই প্রস্তাবে সকলেই তখন রাজী হয়ে গেল।

পরদিন। খুব ভোরে সবার আগে যিনি কাবাঘরে এলেন, তিনি আর কেউ নন, শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা)। তাঁকে দেখেই কুরাইশগণ আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'আল-আমীন' এসেছেন, 'আল-আমীন' এসেছেন। ইনি যা বিচার করে দেবেন আমরা নিশ্চয়ই তা মেনে নেব।

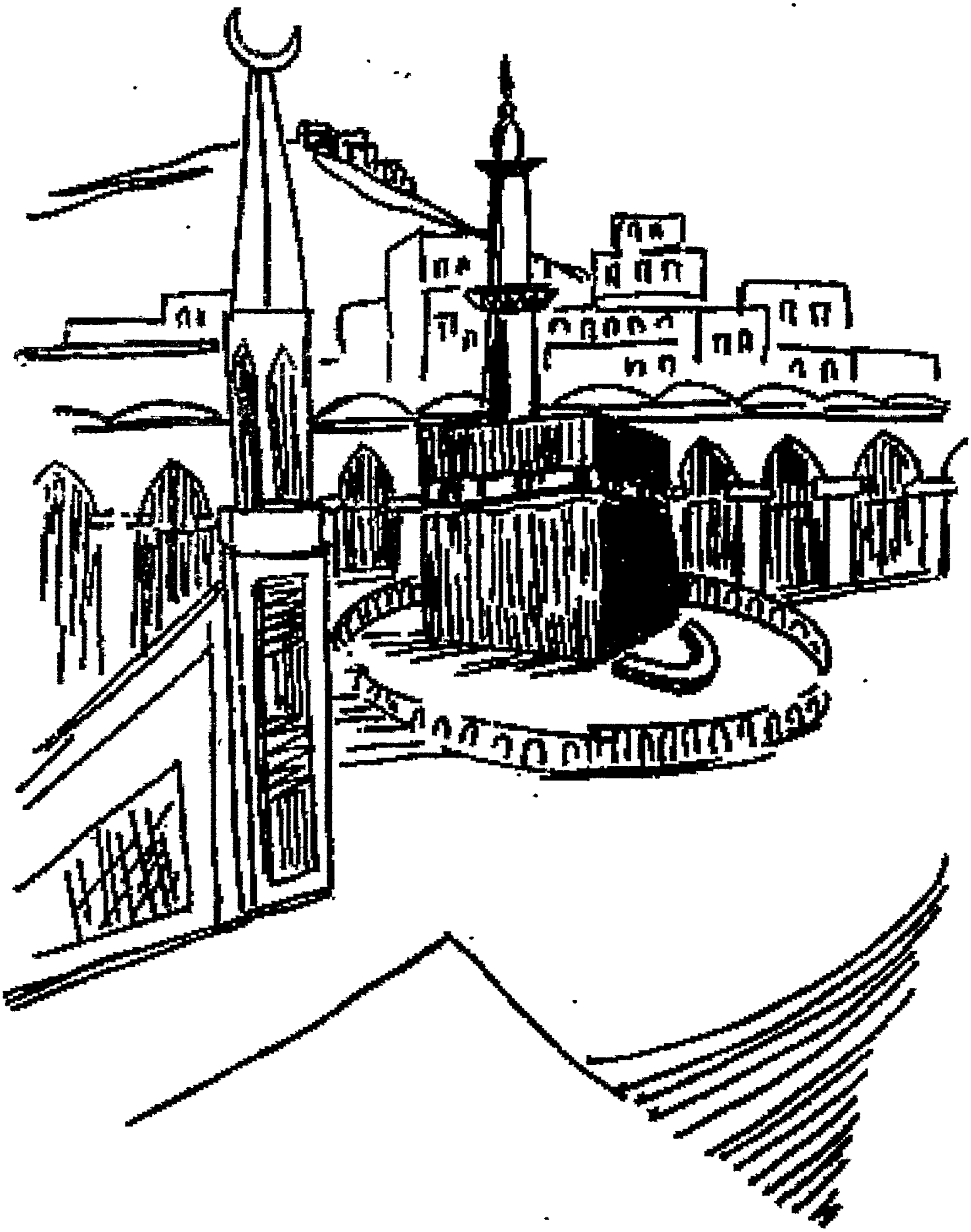
রাসূলে আকরাম (সা) তখন একখানা চাদর আনতে বললেন। চাদর আনা হলো। চাদরখানা বিছিয়ে তিনি তাঁর পবিত্র হাতে 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' উঠিয়ে চাদরের ওপর রাখলেন। তারপর, সব গোত্রের নেতাদের ডেকে বললেন– এবার সবাই চাদরের প্রান্ত-দেশ ধরে নিয়ে চলুন।

একবাক্যে স্বীকার করল সবাই–

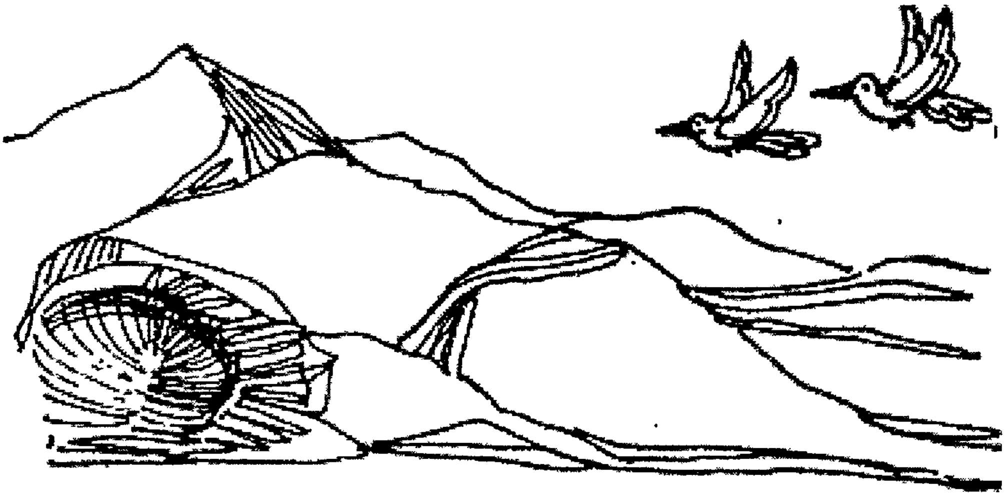
"সুন্দর এই মীমাংসা তব, আমীন হেজাজে ধন্য
তুমি রাখ এই পাথর একাই, ছুঁইবে না কেহ অন্য।"

(নজরুল)

পাথর নিয়ে যাওয়ার পর তিনি নিজ হাতে সেটাকে বসিয়ে দিলেন। আমাদের নবীজী তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে কত সহজ ও সুন্দরভাবে একটা বিবাদের মীমাংসা করে দিলেন। সবাই খুশি হলো। একটা গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পেল। এই সময় আমাদের প্রিয় নবীর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর।



এগারো



মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে হেরা পাহাড়। সেই পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় হযরত একাকী বসে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কখনো একদিন, কখনো দু'দিন, কখনো তিন দিন বা তারও বেশি। বয়সের সঙ্গে তাঁর এই তন্ময়তা, সত্যের অনুসন্ধান যিকিরের সময় আরো বেড়ে গেল। তখন আর দিন নয়। একটানা একমাস বা তারও বেশি সেই নির্জন-নিরালা হেরাকন্দরে থাকতে লাগলেন। নবুওতের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে স্বীকৃতি পাবার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস তিনি দেখতে লাগলেন। যা ভাবেন তাই হয়। স্বপ্নে যা দেখেন তাই সত্য হয়। নতুন নতুন অনুভূতিতে দেহ-মন অভিভূত হতে লাগল। অদৃশ্যলোকের গায়েবী আওয়াজ আসতে লাগল তাঁর কানে। তাঁর চলার পথে পাথর কথা কয়, গাছেরা কথা কয়, সালাম জানায়– 'আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ। রসূলুল্লাহ (সা) থমকে দাঁড়ান। চম্‌কে ওঠেন। শিউরে ওঠে অনির্বচনীয় অনুভূতিতে সারা দেহ, সারা মন। কে ? কে সালাম দেয় ?

আল্লাহ্‌র রাসূল চল্লিশ বছর বয়সে পা দিয়েছেন। আলোর নবী ইবাদতে মশগুল। রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ সেদিন। গভীর রাত। নবীজী গুহার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। সহসা গায়েবী আওয়াজ শূন্য থেকে ভেসে এলো।

'মুহাম্মদ।'

কে ডাকে ? চারদিকে তাকিয়ে দেখেন। কোথাও কেউ নেই। আবার সেই ডাক। একবার দু'বার তিনবার। কিন্তু কাউকেই দেখতে পান না। ভীত-সন্ত্রস্ত নবীজী চারদিকে তাকান। কে ? কে ডাকে ? সহসা এক নূরানী ফেরেশতা তাঁর সামনে এসে হাজির। মাথায় জ্যোতির মুকুট। সর্বাঙ্গে সবুজ রঙের লেবাস। রসূলে-খোদা বিস্মিত চোখে চেয়ে থাকেন সেই অপরূপ জ্যোতির্ময় ফেরেশ্‌তার দিকে। তিনি আর কেউ নন্‌, যিনি সব নবীর কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দিতেন–

সেই স্বর্গীয় দূত জিবরাইল (আ)। তিনি হযরতকে একটা লিখিত রেশমী রুমাল দেখিয়ে বললেন– পড়ুন।

তিনি বললেন– আমি তো পড়তে পারি না। জিবরাইল (আ) হযরতকে নিজের বুকে দুই বাহু দিয়ে চেপে ধরলেন। হযরতের সমস্ত শরীর ঘেমে উঠল। ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললেন– পড়ুন। হযরত পুনরায় জবাব দিলেন– আমি পড়তে জানি না।

জিবরাইল (আ) পুনরায় আগের মত বুকে জড়িয়ে একটু চাপ দিলেন। তিনবার এইরূপ করার পর রাসূলে-খোদা জিবরাইল (আ)-এর সাথে সাথে পড়তে লাগলেন–

"পড়ো, সেই বিশ্বস্রষ্টা আপন পরওয়ারদিগারের নামে। যিনি জমাট রক্ত-বিন্দু থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, তোমার প্রতিপালক প্রভু, সেই মহা-গৌরবান্বিত পরওয়ারদিগারের নামে, যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। এবং মানুষকে ঐ জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা আগে জানতো না।"

এতদিনের সাধনা তাঁর সফল হলো। আরবের 'আল আমীন' আজ মানুষের নবী—মহানবী হিসেবে আল্লাহ্‌র স্বীকৃতি পেলেন। তাঁর মনের ভিতর গুন্ গুন্ করে গুঞ্জরিত হতে লাগল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' মনে হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার যেন তাঁর বুকে খোদাই হয়ে গেছে। সহসা শুনতে পেলেন পাহাড়ের নিকট থেকে কে যেন বলছে– আয় মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ– পয়গম্বর, আর আমি হচ্ছি স্বর্গীয় দূত- ফেরেশ্‌তা জিব্‌রাইল। আওয়াজ শুনে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সমগ্র আকাশ যেন নূরের আলোকে ঝল্‌মল্ করছে। ভয়-ভীতিহীন নবী ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

আল্লাহ্‌র নবী বাড়িতে এলেন। কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরে প্রবেশ করেই বিবি খাদিজা (রা)-কে ডাকলেন। বললেন– শিগ্‌গির একখানা কম্বল দিয়ে আমার শরীরটা ঢেকে দাও।' বিবি খাদিজা (রা) তাড়াতাড়ি একখানা কম্বল এনে তাঁর পবিত্র দেহ ঢেকে দিলেন।

জিজ্ঞেস করলেন–

কি হয়েছে? এমন করছেন কেন?

রাসূলে-খোদা বললেন, জানি না– আজ আমার এ কী হলো?

বিবি খাদিজা অভয় দিলেন।

বললেন– মিথ্যা ভয় পাচ্ছেন। আল্লাহ্ আপনার কোন অমঙ্গলই করতে পারেন না। সর্বদাই আপনার প্রতি তাঁর অসীম করুণা ও রহমত রয়েছে। কারণ, আপনি সর্বদা সত্য কথা বলেন। সর্বদা সত্যপথে চলেন। কারো ক্ষতি করেন না। কেউ আপনার ক্ষতি করলেও তার প্রতিশোধ নেন না। আল্লাহ্‌র প্রতি আপনার অটল বিশ্বাস। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করেন। দুর্বলের প্রতি দয়া দেখান। অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করেন। দুঃখীর দুঃখ দূর করেন। সুতরাং আপনার মত মহৎ ব্যক্তির কোন ক্ষতিই আল্লাহ করবেন না। বলুন– কি হয়েছে?

নবীজী তখন সাহস পেলেন। আশ্বস্ত হলেন। সব খুলে বললেন বিবি খাদিজা (রা)-কে। বিবি খাদিজা আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, কোন ভয় নেই। আপনি আনন্দ করুন। অন্তরে শক্তি সঞ্চয়

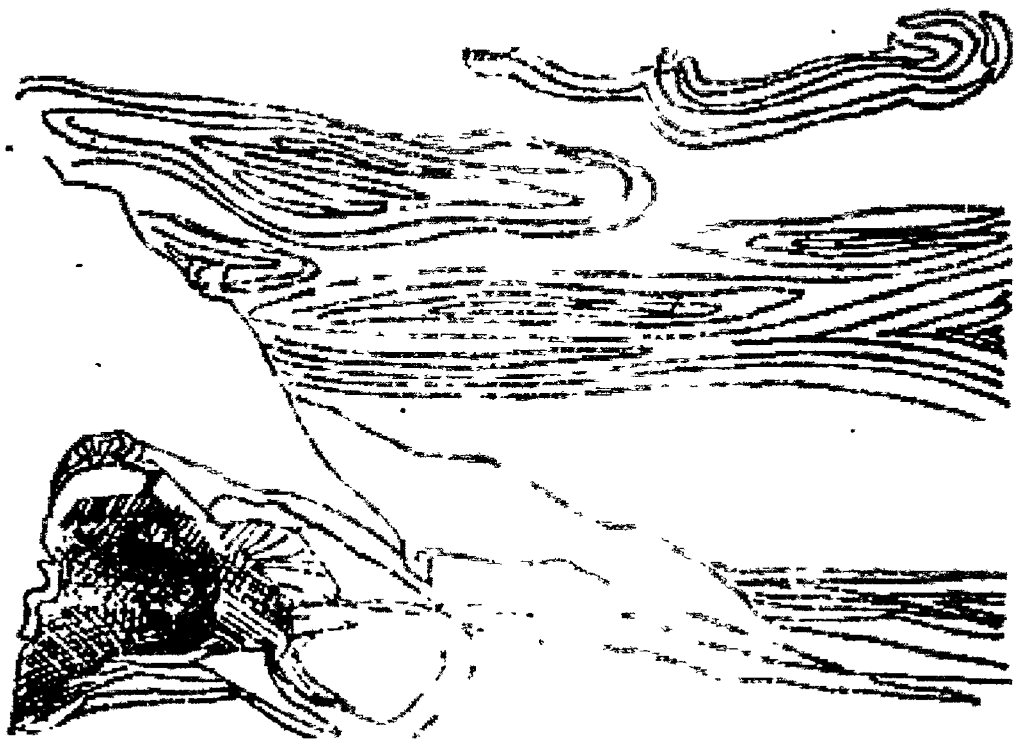
করুন। সেই আল্লাহ– যাঁর হাতে এই খাদিজার জীবন, তাঁকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি– আপনি সত্যিই আল্লাহ্‌র নবী।

তারপর বিবি খাদিজা নবীজীকে সাহস দেবার জন্যে এবং এর সত্যতা প্রমাণের জন্যে, তাঁর জ্ঞাতি-ভাই অরাকা বিন্ নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান-বৃদ্ধ। সব ঘটনা শুনে আনন্দে তিনি চিৎকার করে বললেন–

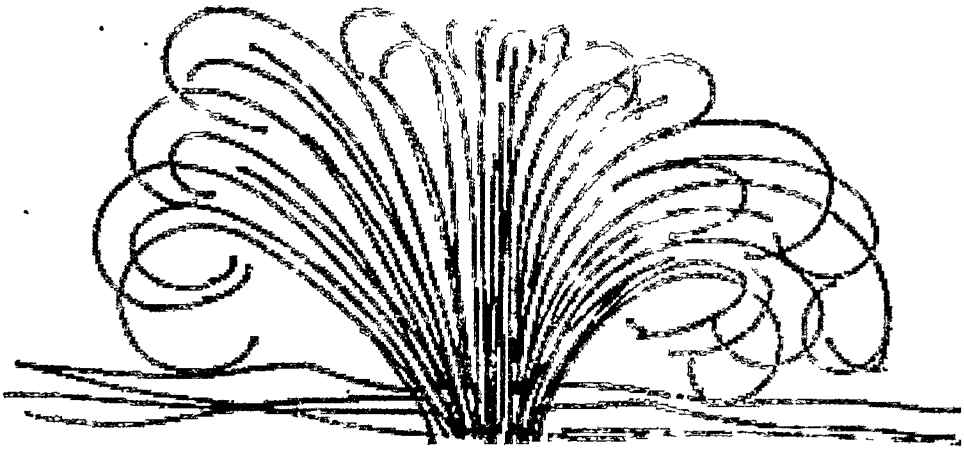
'উনি তো আল্লাহ্‌র দূত স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তা জিব্‌রাইল। দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন, সকলের কাছেই তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ব'য়ে এনেছেন। হযরত মূসা (আ)-এর কাছেও তিনি আসতেন। কিন্তু সাবধান! আপনার স্বজাতি আপনার কদর বুঝবে না। তারা আপনাকে যন্ত্রণা দেবে, দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। হায়! আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকতাম।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরই অরাকার মৃত্যু হয়। বিবি খাদিজা (রা) আল্লাহ্‌র নবীকে স্বীকার করে নিলেন। তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে পড়লেন কলেমা তাইয়েবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' এক আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) তাঁর প্রেরিত রাসূল।

দুনিয়ার প্রথম মুসলমান বিবি খাদিজা (রা)। দুনিয়ার আদর্শ নারী, মুসলিম-কুল-জননী, বিবি খাদিজা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নবীজীর সাথে ছায়ার মত থেকেছেন। বিপদে তাঁকে সাহায্য করেছেন। সাহস যুগিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন।



বারো



এরপর একদিন ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আ) এসে নবীজীকে বললেন– 'আল্লাহ্ পাক আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং তওহীদের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেবার জন্যে আদেশ করেছেন।' তারপর তাঁকে নিয়ে এক ময়দানে গিয়ে জমিনে পদাঘাত করলেন। সেই আঘাতে সেখানে সৃষ্টি হলো একটা পানির ফোয়ারা। সেই পানিতে হযরত জিব্‌রাইল (আ) নিজে ওযু করলেন এবং নবীজীকে ওযুর নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিলেন। তারপর নিজে ইমাম হয়ে তাঁকে দুই রাকাত নামায পড়া শিখিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাসূলে-খোদা ঘরে ফিরে বিবি খাদিজা (রা)-কেও ওযু এবং নামায শিক্ষা দিলেন। তারপর ?

তারপর আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে তিনি তৎপর হলেন। নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন বিবি খাদিজা (রা) তা আগেই বলেছি। এবার পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন– তিনি হলেন মহাবীর হযরত আলী (র)। যিনি পরবর্তী জীবনে ইসলামের চতুর্থ খলীফা হয়েছিলেন। যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমুদ্দুর–সাহসিকতার জন্যে যাঁর উপাধি ছিল 'শেরে খোদা'। যাঁর ভুবন-বিখ্যাত অমর দুই পুত্রের নাম হচ্ছে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত হোসাইন (রা)। হযরত আলী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

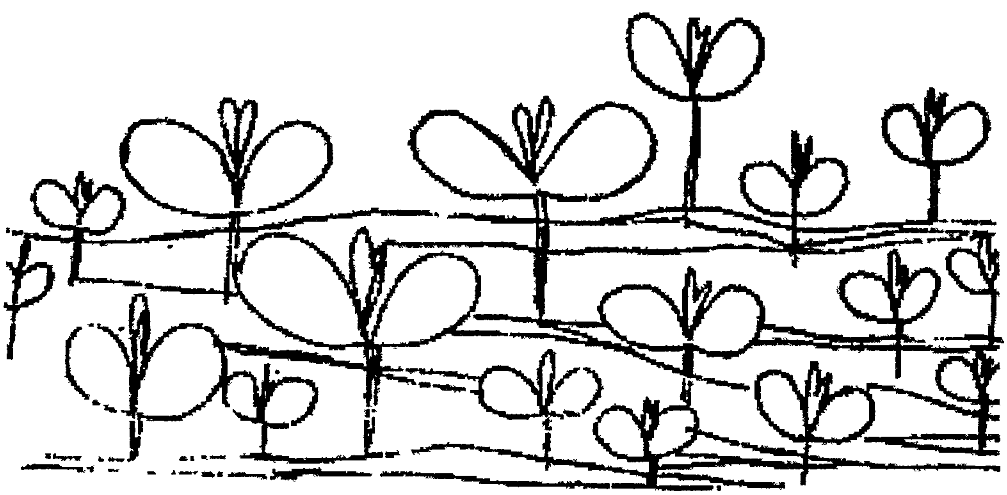
নবীজী হযরত আলী (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের আড়ালে চলে যেতেন। তারপর নামায আদায় করে ফিরে আসতেন। এভাবে কিছুদিন কাটলো। কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেলেন চাচা আবূ তালিবের কাছে। আবূ তালিব ঘটনাক্রমে একদিন সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, নবীজী হযরত আলী (রা)-কে সাথে নিয়ে এক নতুন নিয়মে ইবাদত করছেন। নামায শেষ হলে আবূ তালিব জিজ্ঞেস করলেন–তুমি আবার এ কোন্ ধর্ম পালন করছো ? নবীজী উত্তর দিলেন–এটা আল্লাহ্‌র ধর্ম। আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তাদের ধর্ম। আল্লাহ্‌র রাসূলগণের ধর্ম। আমাদের পূর্ব-পুরুষ হযরত

ইবরাহীমের ধর্ম। আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতে এজন্যেই পাঠিয়েছেন, যেন পথ-ভ্রান্তদের সৎপথে আনতে পারি। চাচাজান! আপনাকেও আমি এই দীন ইসলাম গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি এই সত্য প্রচারে আমাকে সাহায্য করুন।

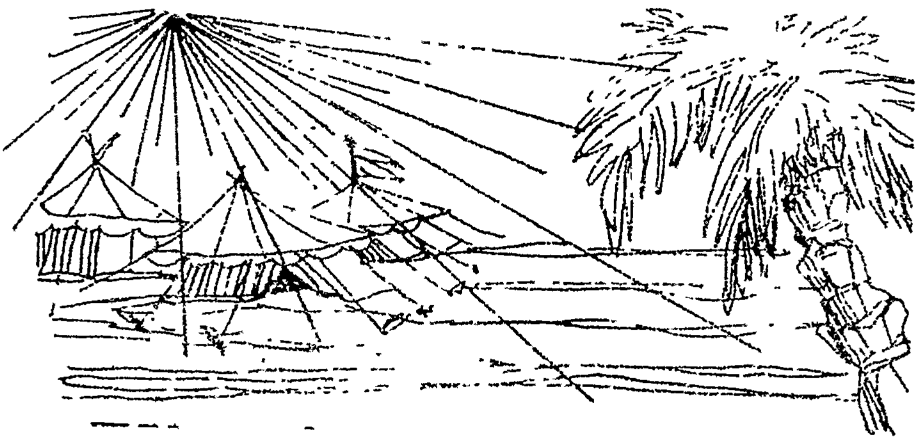
আবূ তালিব আপন পুত্র হযরত আলী (রা)-কে ঐ একই প্রশ্ন করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ্ ও তাঁর পয়গম্বরের উপর ঈমান এনেছি। তাঁর পথই আমার পথ। আমি সব সময়ই তাঁর সাথে থাকবো। তিনি খুশিই হলেন। কিন্তু পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে চাইলেন না। হযরতকে বললেন, পূর্ব-পুরুষের ধর্ম তো আমি ছাড়তে পারি না। তবে সর্ব-শক্তিমান সেই আল্লাহ্‌র নামে আমি শপথ করছি, আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর হযরত আলীকে বললেন– তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, মুহাম্মদ (সা) কখনও তোমাকে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে না।

এর পরেই মক্কা নগরীর সর্বজন শ্রদ্ধেয়, বিজ্ঞ ও সৎ ব্যক্তি বলে পরিচিত আবূ বকর (রা) ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরাইশদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে ধীর-স্থির, জ্ঞানী, উদার, মহৎ ও শরীফ লোক। তাঁর যেমন সুনাম ছিল, তেমনই ছিল প্রভাব-প্রতিপ্রত্তি। তাঁর আহ্বানে হযরত ওসমান, জোবায়ের, আবদুর রহমান বিন্ আওফ, সা'দ বিন্ আবূ ওক্কাস ও তালহা (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এঁদের পূর্বে হযরতের পালক-পুত্র ক্রীতদাস যায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর একে একে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে নয়, চুপি চুপি। একটা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়া সহজ কথা নয়! এর জন্যে চাই শক্তি-সাহস, মনোবল, জনবল, অর্থবল।

প্রথম তিন বছরে মাত্র ত্রিশজন লোক ইসলাম কবুল করলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সত্যানুসন্ধানী, সচ্চরিত্র ও পবিত্র মনের অধিকারী। এঁদের মধ্যে একজনের নাম আবূ যর। তাঁর নামে ঢাকায় একটা কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলাম প্রচারের পূর্বেই তিনি মদ্যপান ত্যাগ করেন। মূর্তিপূজাও ছেড়ে দেন।



তেরো



সত্য চাপা থাকে না। ধীরে ধীরে সবার কাছে হযরতের নতুন ধর্ম-মতের কথা পৌঁছে গেল। এদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে আদেশ এল!

"তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা প্রকাশ্যে এবার প্রচার কর– মুশরিক যারা, তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও... আর তোমার আত্মীয়-স্বজনদের আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখাও। তারপরও তারা যদি তোমার কথা না মানে, তবে তুমি বল... তোমাদের কাজে আমি অসন্তুষ্ট। তুমি ভরসা রাখ মহাপরাক্রমশালী একমাত্র দয়াময় আল্লাহ্‌র উপরে।"

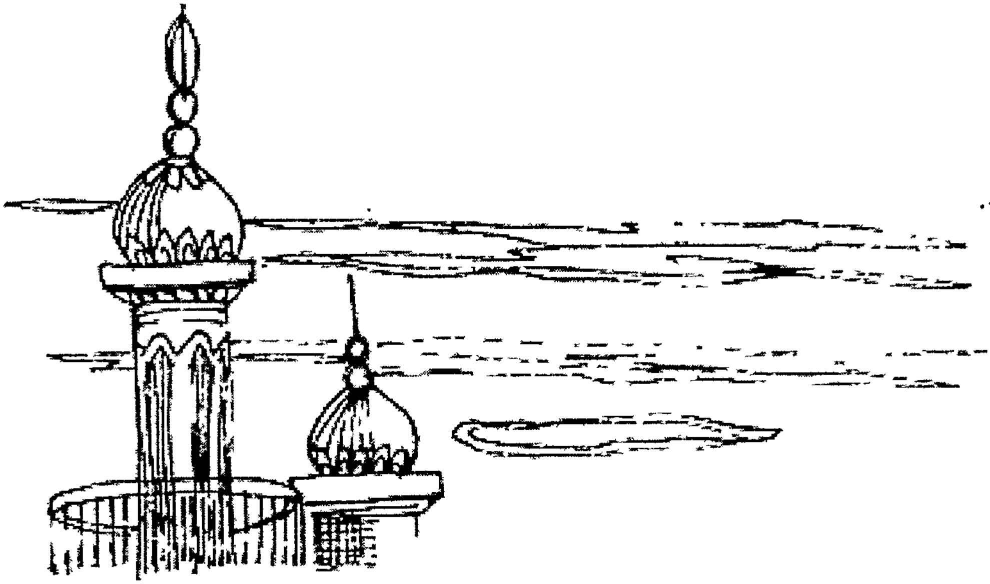
এইভাবে টেনে দেওয়া হলো সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা। শুরু হলো সংগ্রামের সূচনা। হক ও বাতিলের লড়াই।

আগেই বলেছি, কাবাঘরে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। আর তার দেখাশুনার ভার ছিল কুরাইশদের উপর! তাই, কুরাইশরা ছিল তার পুরোহিত। সর্দারী ছিল তাদেরই হাতে। সব গোত্রের শ্রেষ্ঠ তাঁরা। বিপদে-আপদে, কামনা-বাসনায়, সবাই সেই দেব-দেবীর শরণাপন্ন হতো। ধুমধামের সাথে তাদের পূজা করত। মানুষের নবী আল্লাহ্‌র আদেশে এবার প্রকাশ্যে প্রচার করলেন– নতুন বাণী। বিপ্লবের বাণী–

'শোন হে মানুষ ভাই–
আল্লাহ্‌র কাছে ছোট বড় ভেদ নাই।
সকলে এক সমান, এক আল্লাহ্‌রই দাস
তাহারে ডাকিতে পুরুতের ফরমান
মানিবার আর কোন প্রয়োজন নাই–
এক আল্লাহ্‌র বান্দা তোমরা সকলেই ভাই ভাই।
নিরাকার এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় মাবুদ নাই।

—নজরুল

চৌদ্দ



রাসূলে আকরাম (সা) একদিন কাবাঘরের নিকটবর্তী সাফা পর্বতের উপর উঠে আশংকা-জড়িত কণ্ঠে নিজের কওমের সবাইকে ডাক দিলেন। ঘোষণা করলেন– আসন্ন এক বিপদ-বার্তার। সবাই দলে দলে ছুটে এলো সাফা পর্বতের পাদদেশে। কারণ, তারা জানত 'আল আমীন' মিথ্যা বলেন না। তিনি যা বলেন তা সত্য। নিশ্চয়ই কোন মহা-বিপদের ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন, যার জন্যে এভাবে ডাক দিয়েছেন। তারা এবার অধীর আগ্রহে জানতে চাইল—ব্যাপার কি? নবীজী জলদ-গম্ভীর স্বরে বললেন, প্রথমে বলুন,–

আমি যে কথাই বলি না কেন, আপনারা কি তা বিশ্বাস করবেন?

জবাবে একবাক্যে সবাই জানাল– 'নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব।

কারণ?

কারণ, তোমাকে আমরা আল আমীন বলেই জানি। সর্বদাই তুমি সত্য কথা বলে থাক। কোন দিন তোমার মুখে মিথ্যা কথা শুনি নি। তোমার চরিত্রে কোন দোষ দেখি নি। চাঁদের মতই তুমি কলঙ্কহীন।

রাসূলে-খোদা (সা) তখন বললেন– 'আচ্ছা এবার যদি বলি যে, এই পাহাড়ের আড়ালে একদল ঘোড়-সওয়ারী অতর্কিতে আমাদের আক্রমণের জন্যে আসছে– তাহলে আপনারা কি তা বিশ্বাস করবেন?

সকলেই সমবেত কণ্ঠে বললেন– নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। তখন নবী করীম (সা) ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন–

আমি আপনাদের ডাক দিয়েছি পরম শক্তিমান বিশ্বপ্রভু এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তির ভয় দেখাবার জন্যে।

এই কথা শুনে আবূ লাহাব তো রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা। বললো,– ওঃ! এজন্যে আমাদের ডেকেছিলি ? তুই ধ্বংস হ! তোর ধ্বংস অনিবার্য! অন্য যারা এসেছিল, তারাও এই কথা শুনে ক্রোধে নানান কটু কথা বলতে বলতে চলে গেল। কিন্তু নবীজী নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করলেন–

"আল্লাহ তা'আলার কসম; কাবার ঐ
'লাৎ' 'ওজ্জার' করিব না পূজা, জানিনা আল্লা বই।
নিজ হাতে যারে করিল সৃষ্টি খড় আর মাটি দিয়া
কোন নির্বোধ পূঁজিবে তাহারে হায় 'স্রষ্টা' বলিয়া ?"

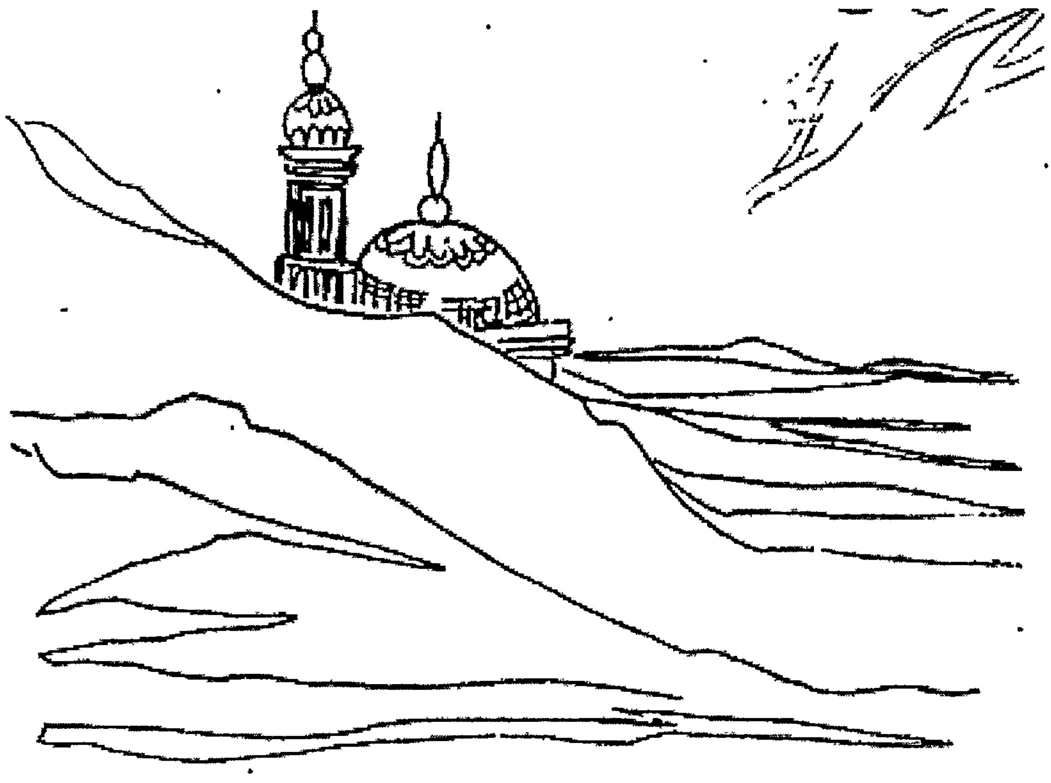
(নজরুল)

তারপর ?

তারপর– 'ক্রমে ক্রমে সব কুরাইশ জানিল, মুহাম্মদ আমীন
করে না কো পূজা কা'বার ভূতেরে ভাবিয়া তাদেরে হীন।

(নজরুল)

এবার শুরু হলো। হক ও বাতিলের সত্য ও মিথ্যার প্রকাশ্য লড়াই।



পনেরো



আল্লাহ্‌র নবী এবার সত্য প্রচারে এক আল্লাহ্‌র তওহীদ প্রচারে নামলেন। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা শুরু করলেন। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন–

'ভাই সব! তোমরা সৎকাজ কর—নেক আমল কর। দোজখের ভীষণ আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করো। আল্লাহ্‌র আজাব থেকে রক্ষা করার কোন অধিকার আমার নাই। তোমরা শুধু স্বীকার কর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, নেই আর দ্বিতীয় কোন উপাস্য।

যারা মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল, যারা চরিত্রের দিক দিয়ে হীন. যারা ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখে, অন্যায়ের প্রতি যারা আসক্ত, যারা মিথ্যার পূজারী, সত্যকে তারাই ভয় করে। সত্যের বিরুদ্ধে, শান্তির বিরুদ্ধে সর্বদা তারাই বিদ্রোহ করে। শান্তির দূত, শান্তির বাণীবাহককে তারা সহ্য করতে পারে না। পুণ্যের কথা, ন্যায়ের কথা, হিতোপদেশ তারা শুনতে চায় না। তাদের সাধনা, তাদের ধ্যান, তাদের জ্ঞান, তাদের বিদ্যা উপার্জনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় পার্থিব ঐশ্বর্য, পার্থিব সুখ আর শান্তি। সেটাই তাদের চরম পাওয়া। তাই যে ভাবে হোক, যে পথেই হোক, তা লাভ করার জন্যে তারা পাগল হয়ে ওঠে।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা, নবীজীর মসজিদে যাওয়ার পথে বন থেকে বাবলা কাঁটা এনে রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে দিত। তাঁকে মারার জন্যে পাথর হাতে ঘুরে বেড়াত। আবূ লাহাবও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলো। সে ছিল সম্পর্কে নবীজীর চাচা। মক্কার একজন নামজাদা লোক এবং ধনী ব্যক্তি। তাদের শত্রুতায় আল্লাহ্ তা'আলা নাখোশ হন এবং তাঁদের শাস্তির পূর্বাভাস দিয়ে 'তাব্বাত ইয়াদা' সূরা নাযিল করেন। তোমরা নিশ্চয়ই 'সূরাটা' পড়েছ?

এরপর আল্লাহ্‌র নবী নিজের স্বজাতির প্রতিটি গোত্রকে, এমন কি নিজের কন্যা বিবি ফাতেমাকেও ডেকে বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার নিজ কওমকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়

দেখাবার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। আমি তোমাদের কারও লাভ বা ক্ষতির অংশীদার নই। তোমরা শুধু এই কথা মনেপ্রাণে স্বীকার কর, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।

তিনি আল্লাহ্‌র নবী। বিবি ফাতেমা তাঁর আদরের দুলালী। তবুও তিনি তাঁর কন্যার কর্মফলের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে কোন সুপারিশ পেশ করবেন না। তিনি কোন অন্যায় করলে, প্রাপ্য শাস্তি তাঁকে ভোগ করতেই হবে। নবী দুলালী বলে রেহাই পাবেন না। মানুষের নবী, আল্লাহ্‌র নবী, সত্যের নবী, তা জানিয়ে দিলেন কন্যাকে।

শুধু ঘরের লোকজনকে আলোর পথে ডাকলে তো চলবে না। ঘরের বাইরে যে অন্ধকার। সেখানে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পথ না পেয়ে হোঁচট খাচ্ছে, তাদেরও তো পথ দেখাতে হবে। অন্ধকারের জীব আলো দেখলেই চেঁচায়। মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে।

কিন্তু যারা আলোর পাখি, আলোর পথে ডাকবে যে,
ঝঞ্ঝা তুফান পাড়ি দিয়ে অন্ধকারের পথিককে।

আলোর নবী, সত্যের নবী যখন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে নামলেন এবং মূর্তিপূজার নিন্দা করে, নিরাকার এক ও অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্যে সবাইকে ডাকতে লাগলেন, তখন কুরাইশ প্রধানরা দেখল ভারী বিপদ। তারা দল বেঁধে আবূ তালিবের কাছে এলো। বললো, 'এতদিন আপনার খাতিরে আমরা অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের মা'বুদকে ঘৃণা করবে, প্রকাশ্যে বাপ-দাদাদের গোমরাহ্ বলবে, আমাদের নির্বোধ বলবে– এ অসহ্য। এখন হয় আপনি আমাদের মাঝখান থেকে সরে দাঁড়ান, নয় তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন।'

আবূ তালিব তখনকার মত তাদের মিষ্টি কথায় প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে বিদায় দিলেন। তারপর হযরতকে ডেকে বললেন,– মুহাম্মদ। আমার ওপর এমন গুরুভার চাপিয়ো না, যা বইবার শক্তি আমার নেই।

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে নবীজী বললেন,– চাচাজান! আমার জন্যে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। ঐ পাক জাত আল্লাহ্‌র কসম, ওরা যদি আমার এক হাতে সূর্য আর এক হাতে চাঁদও এনে দেয়, তবুও আমি আমার কর্তব্য থেকে এক পাও নড়বো না।

আবূ তালিব তাঁর কথা শুনে এত অভিভূত হলেন যে, তিনি তাঁকে নির্ভয়ে তাঁর ইচ্ছামত কাজ করার অনুমতি দিলেন এবং তাঁর কাজে সাহায্য করারও আশ্বাস দিলেন। এরপর রাসূলে করীম (সা) পূর্ণোদ্যমে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার শুরু করলেন। কুরাইশরাও শুরু করে দিল পুরোদমে শত্রুতা। কিন্তু আবূ তালিব ও তাঁর অন্যান্য বন্ধু নবীজীর পশ্চাতে থাকায় তারা সফল হতে পারল না। শত্রুরা তখন অন্য পথ ধরল।

শত্রুদের পক্ষ থেকে কয়েক জন এসে নবীজীকে বলল—দেখুন, আপনি শরীফ বংশের লোক হয়ে মিছেমিছি আমাদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করছেন। আমাদের দেবতাদের ঠাট্টা করছেন। বাপ-দাদাদের বিধর্মী, মূর্খ বলছেন। এগুলো কি উচিত হচ্ছে? আপনি যদি ধন-সম্পদ চান, বলুন– আপনাকে অগাধ ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে দেব। যদি সম্মান চান-বলুন, আপনাকে আমাদের সর্দার করে

নেব। যদি রাজত্ব চান, আপনাকে আমাদের বাদশাহ্ বানাব। আর যদি কোন জিন আপনার উপর ভর করে থাকে– তাও বলুন। ভাল ওঝা ডেকে তাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করব।

হযরত জবাবে কুরআন শরীফ থেকে একটা আয়াত পড়লেন। যার অর্থ হচ্ছে– 'এই আদেশ দাতা ও দয়াময় আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে, এটা তোমাদের শোনবার মতো। তোমরা যাতে সহজে বুঝতে পার, সেজন্যে এটি তোমাদের মাতৃভাষা আরবী জবানে এসেছে। এটি সুখের সংবাদ, অনুগ্রহের পরিচায়ক এবং আজাবের ভয়-প্রদর্শক।'

এ কথা শুনে কুরাইশরা যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, এ সব কথা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে না। ঠিক তখনই আল্লাহ্ পাকের ওহী নাযিল হলো।

–'হে নবী! ওদেরকে বলুন আমি তোমাদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ। শুধু তফাৎ এই যে, আমার উপর আল্লাহ্র পয়গাম এসেছে। তোমাদের উপাস্য এক, তাঁরই প্রতি আকৃষ্ট হও। তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর কাছে ঐ সমস্ত লোকের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর, যারা সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করে, আল্লাহ্র পথে খরচ করে না, হাশরের দিনকে বিশ্বাস করে না। যে সমস্ত লোক আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে এবং সৎকাজে রত আছে, তাদের জন্যে সীমাহীন সুখ ও শান্তি অপেক্ষা করছে।

আল্লাহ্র এই বাণী শুনে তারা একেবারে 'থ' হয়ে গেল। কারও মুখ দিয়ে আর একটাও কথা বেরুল না। নীরবে তারা সরে পড়ল।



ষোলো

এবার কুরাইশদের অত্যাচার শুরু হলো।

একদিন আল্লাহ্‌র রাসূল কাবা শরীফের চত্বরে নামায পড়ছেন। আবূ জেহেলের আদেশে কসাইখানা থেকে এক ব্যক্তি ভেড়ার গলিত নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে এলো। যেই তিনি সিজদায় গিয়েছেন, অমনি সেই নাড়ীভুঁড়ি তাঁর পবিত্র কাঁধের উপর চাপিয়ে দিল। তারপর তারা দল বেঁধে আনন্দে চিৎকার শুরু করল। দুষ্ট ছেলেরা যেমন পাগলকে জব্দ করে তামাশা দেখে– তার কষ্ট দেখে আনন্দ পায়, ঠিক তেমনি আর কি!

নবী দুলালী বিবি ফাতেমা দেখতে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন এবং নিজ হাতে সেটা সরিয়ে দিলেন। শুধু কি তাই ? প্রতিদিন আবূ লাহাব হযরতের ঘরের সামনে নোংরা আবর্জনা এনে ছড়িয়ে দিয়ে যেত। আর আবূ লাহাবের স্ত্রী জংগল থেকে কাঁটা এনে রাসূলুল্লাহ্‌র চলার পথে বিছিয়ে রাখত। একথা আগেই বলেছি। তিনি যখন কোন মাহ্‌ফিলে কুরআন শরীফ পাঠ করতে দাঁড়াতেন, তখন দুশ্‌মনরা এমন ভাবে হৈ-চৈ শুরু করে দিত যে, তাঁর কথা আর কেউ শুনতে পেত না। তিনি যখন মনের দুঃখে ঘরে ফিরতেন– তখন জালিমরা তাঁর প্রতি পাথর ছুঁড়তো, আর তাঁর পবিত্র দেহ সেই আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত।

এত করেও তাদের মনের সাধ মিটতো না। একদিন নবীজীকে একাকী পেয়ে তারা তাঁর পবিত্র গলায় কাপড়ের রশি দিয়ে পশুর মত টানতে লাগলো। তাঁর দম প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম, এমন সময় হযরত আবূ বকর দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন এবং তাঁকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু এর বদ্‌লায় তারা হযরত আবূ বকরকে এমনভাবে প্রহার করেছিল যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যের আলো যাদের অন্তরে জ্বলে, আল্লাহ্‌র অপার করুণার পরশ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা কি এই অত্যাচারে দমেন ? দমেন না। সারা দুনিয়ার সুখ আর সম্পদের বিনিময়েও তাঁদের কেনা যায় না।

নবুওতের প্রথম তিন বছর নবীজীর প্রচারের ফলে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র তিরিশ জনে। তাঁদের উপরও নেমে এলো কুরাইশদের নির্মম নির্যাতন। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত

বেলালের নাম তোমরা শুনেছ। তিনি ছিলেন হাবশী ক্রীতদাস। তাঁর মনিব উমাইয়া বিন খাল্‌ফ ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে হযরত বেলালকে মরুভূমির তপ্ত বালুর উপর চিৎ করে শুইয়ে তাঁর বুকে ভারী পাথর চাপিয়ে দিত। রৌদ্র-দগ্ধ বালুতে তাঁর পিঠ পুড়ে যেত। পাথরের চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো। গলায় রশি দিয়ে টানতো। তবু তিনি ইসলাম ত্যাগ করেন নি। সেই অবস্থাতেও তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতো– 'আন্তা আহাদুন. আন্তা আহাদুন।' আল্লাহ্ তুমি এক, তুমি এক। হযরত আবূ বকর তাঁর এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাঁকে কিনে নেন এবং মুক্ত করে দেন।

রাসূলে করীম (সা)-এর আর এক ভক্তের নাম ছিল ইয়াসির (রা)। নিষ্ঠুর কুরাইশরা তাঁকে কি করেছিল জানো ? পুতুল পূজা ছাড়ার অপরাধে, সত্যকে গ্রহণ করার অপরাধে তাঁর দুই-পা দু'টি উটের পায়ের সাথে বেঁধে উট দুটিকে দুইদিকে চালিয়ে দিয়েছিল। ফলে তাঁর শরীর মাঝখান থেকে চিরে দুইভাগ হয়ে গিয়েছিল। আর তাঁর সতী স্ত্রী যখন স্বামীকে রক্ষার জন্যে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছিল, তখন তাঁকে বল্লম দিয়ে বন্য পশুর মত হত্যা করা হয়েছিল।

তারা ভেবেছিল এই রকম অত্যাচার করলেই আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে সাহস পাবে না। মুহাম্মদ (সা)ও তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু তাঁরা জানতো না সত্য অনির্বাণ। এর জ্বলন্ত শিখা ঝড়-ঝঞ্ঝায় নেভে না। শত নির্যাতন-নিপীড়নে এর গতিপথ রুদ্ধ করা যায় না। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, পার্থিব ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি যাদের একমাত্র কাম্য, যারা সত্যের আলো অন্তরে উপলব্ধি করেনি, আত্মা যাদের কলুষিত, বিবেক যাদের মৃত, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে যারা অনুভব করে না, তারা কোনদিনই বুঝতে পারবে না– এই আত্মত্যাগের উৎস কোথায় ? কারণ আল্লাহ্ বলেছেন– আমি তাদের সম্মুখে একটি প্রাচীর এবং পশ্চাতে একটি প্রাচীর গেঁথে দিয়েছি, তারপর তাদের দৃষ্টিকে ঢেকে দিয়েছি, যাতে তারা দেখতে না পায়। তা না হলে মানুষ কি পারে মানুষের উপর এই রকম নির্যাতন করতে ?

নও-মুসলিমদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা যতই বাড়ে, ভিতরে ভিতরে তাদের সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকে। নির্জনে-নিশীথে তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকে, আর তাঁর দরবারে তাদের দুঃখ-কষ্ট জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে। নবীজী সব দেখেন, সব শোনেন, তাঁর অন্তর বেদনায় ভেঙে পড়ে। দয়ার নবী নিজের দুঃখ সহ্য করতে পারেন, কিন্তু পরের দুঃখ সইবেন কি করে ? তিনি যে রহমাতুল্লিল আলামীন। শেষে তিনি তাদেরকে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। এঁদের দলে ছিল ৮৩ জন পুরুষ আর ১৮ জন মহিলা। এঁরাই হচ্ছেন ইসলামের প্রথম মুহাজিরীন। তাঁরা আত্মীয়-স্বজন, জন্মভূমি সব ছেড়ে গেলেন– তবু ধর্মকে ও সত্যকে ত্যাগ করলেন না।

এরপর মহাবীর হযরত হামযা (রা) এবং হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা যেমন চমকপ্রদ, তেমনি বিস্ময়কর। মুসলমানদের প্রতি তাঁর অত্যাচার ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ধর্মত্যাগীদের তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। একদিন আবূ জেহেল হযরতের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণের জন্যে এক সভা ডাকলো। বলল— তোমাদের পানিতে ডুবে মরা উচিত। মুহাম্মদ তোমাদের ধর্মের নিন্দা করছে, তোমাদের দেব-

দেবীকে গালাগালি দিচ্ছে, আর তোমরা কাপুরুষের মত বসে আছ ? কেউ এর প্রতিকার করতে পারছ না ? আমি এই মজলিসে শপথ করছি, যে মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারবে তাকে আমি একশ' উট পুরস্কার দেব। রাজী আছ কেউ ?

বীর ওমর উঠে দাঁড়াল। হোবলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করল, যতদিন না সমাজের এই দুশমনকে আমি হত্যা করতে পারব, ততদিন বিশ্রাম আমার হারাম। ততদিন এই হাত থেকে তরবারি নামবে না। তারপর সে খোলা তলোয়ার হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল। পথের মধ্যে তাঁকে এভাবে দৌড়াতে দেখে একজন জিজ্ঞেস করল,– ব্যাপার কি ? এভাবে দৌড়ে যাচ্ছ কোথায় ?

মুহাম্মদকে হত্যা করতে।

লোকটা তাকে বাঁধা দিয়ে বলল,– 'আরে, শোনো শোনো, মুহাম্মদকে হত্যা করার আগে নিজের ঘর সামলাও।' থম্‌কে দাঁড়াল ওমর।

তার মানে ?

তোমার বোন ফাতেমা আর ভগ্নীপতি সাঈদ যে মুসলমান হয়ে গেছে, সে খবর রাখো ?

তাই নাকি!

ওমরের মাথায় খুন চড়ে গেল। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্যে তখুনি ছুটলো বোনের বাসায়। ফাতেমা তখন খাব্বাব (রা)-এর কাছে কুরআনের একটা আয়াত পড়ছিল। ওমরের সাড়া পেয়েই খাব্বাব আর সাঈদ ভয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে পড়ল। ওমর কোন কিছু প্রশ্ন না করেই বোন ফাতেমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। তার শরীর কেটে রক্ত ছুটল। তবু তিনি নির্বিকার। মারতে মারতে ওমর ক্লান্ত। ফাতেমার কণ্ঠে একই কথা– 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি। আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে মেনেছি। এখন তোমার যা খুশি তাই করতে পার।'

আদরের বোন। তার রক্তাক্ত শরীর দেখে, তার বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা দেখে, ওমরের চেতনা ফিরে এলো। বলল, পড়-কি পড়ছিলি ? ফাতেমা অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে, ভক্তি গদ গদ চিত্তে পড়তে শুরু করল–

"সাব্বাহা লিল্লাহে মা-ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকিম"–(যার মানে হচ্ছে,—আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ করে এবং তিনি মহা-পরাক্রমশালী ও মহা-বিজ্ঞানী)। এই পর্যন্ত শুনেই ওমরের দুই চোখে অশ্রু দেখা দিল। তিনি বলে উঠলেন, না-না-! এ বাণী কখনো মানুষের তৈরি হতে পারে না। এ বাণী নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র বাণী। তারপর তলোয়ার হাতে ছুটলেন উন্মাদের মত নবীজীর খোঁজে।

আল্লাহ্‌র নবী রাসূলে আকরাম (সা) তখন সাহাবী যায়েদ ইব্‌নে আরকামের ঘরে অন্যান্য ভক্তকে নিয়ে ধর্ম-আলোচনা করছিলেন। তরবারি হাতে ওমরকে দৌড়ে আসতে দেখে সাহাবীরা ভয়ে অস্থির। তাঁরা নবীজীকে তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে যেতে বলে ওমরের সামনে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো। কিন্তু সত্যের নবী, আল্লাহ্‌র নবী, বীর নবী, তাঁদেরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই এগিয়ে

গেলেন ওমরের সামনে। বেহেশ্‌তী নূরের রেখা পবিত্র মুখে ছড়িয়ে তিনি বললেন, এসো ওমর! আমি তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছি। বলো, কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছো ? সত্যের প্রতি বন্ধু হয়ে, না দুশ্‌মন হয়ে ?

ওমর হযরতের পবিত্র মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু সেই নূরানী চাহনির দীপ্তিতে তাঁর দৃষ্টি আপনা থেকেই নত হয়ে এলো। নত মস্তকে হাতের তলোয়ার নবীজীর পাক কদমের কাছে রেখে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন–

'আমি মুসলমান হিসেবেই আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। এই বলেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে পড়লেন– কলেমায়ে শাহাদত, 'আশহাদু আল্‌লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু'–

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর প্রেরিত রসূল।'

নবী করীম (সা) পরম স্নেহভরে হাত ধরে তাঁকে উঠালেন। আপনার পবিত্র সিনার মাঝে টেনে নিলেন। তারপর তাঁর কপালে চুম্বনের পবিত্র রেখা এঁকে দিলেন।

ওমরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল। শত্রুরা প্রথমে বিস্মিত পরে আতংকিত হলো। হায়! হায়! ওমরও শেষে মুসলমান হয়ে গেল ? আর মুসলমানদের প্রাণে সঞ্চারিত হলো নব-জীবনের স্পন্দন! মনে আনন্দের সঞ্চার। এর পরেই হযরতের চাচা বীর হামযাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। সত্যের শিখা এবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। জ্বলে উঠল হেরার মশাল। পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে। এখন উপায় ?

এবার কাফেরের দল চুক্তিনামার মাধ্যমে হাশেমী বংশের লোকদের একঘরে করার ব্যবস্থা করল। আবূ তালিব মহাবিপদে পড়লেন। এভাবে এখানে বাস করা তো সম্ভব নয়। তখন তিনি তাঁর গোত্রের সবাইকে নিয়ে মক্কার পূর্বদিকে 'শেব-ই-আবূ তালিব' নামক পাহাড়ে ঘেরা একটা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আহা! কি কষ্ট সেখানে। খাবার নেই, পানি নেই। বসতি নেই। শিশুরা ক্ষুধায় ছটফট করে। এভাবে তাঁদের তিন বছর কেটে গেল। শেষে কয়েকজন প্রবীণ কুরাইশ নেতার হস্তক্ষেপে এই চুক্তি রদ হলো এবং তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে এলেন।



সতেরো



নবুওতের দশম বছর। এই বছরকে শোকের বা দুঃখের বছর বলা হয়ে থাকে। কারণ হযরতের একমাত্র অভিভাবক পৃষ্ঠপোষক, যাঁর সাহায্য আর সহযোগিতায় ইসলামের শাশ্বত বাণী দিকে দিকে নবী করীম (সা) ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই চাচা আবূ তালিব হঠাৎ ইন্তিকাল করলেন। তাঁর বিয়োগ ব্যথার উপশম হতে না হতেই, কয়েক দিনের মধ্যে আবার মুসলিমকুল জননী, বিনা প্রশ্নে যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন, হযরতের সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী, একমাত্র সান্ত্বনাদায়িনী, বিবি খাদিজা (রা)ও তাঁকে ছেড়ে জান্নাতবাসিনী হলেন। শোকের পরে শোক। নবী জীবনে এ এক মহাপরীক্ষা। নবীজী বেদনায় একেবারে ভেঙে পড়লেন। তখন তাঁর বয়স একান্ন।

দুশমনরা দেখল এই তো সুযোগ। আবূ তালিব নেই, বিবি খাদিজা (রা)ও নেই। তাদের দুশমনির মাত্রা আরো বেড়ে গেল। শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই। চারদিকে শুধু শত্রু আর শত্রু। হিংস্র-শ্বাপদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

শান্তির সন্ধানে এবার নবীজী মক্কা ত্যাগ করলেন। সহচর যায়েদ বিন্ হারিছকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফের পথে রওয়ানা হলেন। মক্কা থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূরে তায়েফ। নবীজীর চাচা আব্বাস ছিলেন তায়েফের একজন জমিদার। এই জন্যে তাঁর মনে আশা ছিল যে, সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে আশ্রয় দান করবে। ইসলামের প্রচারকার্যে সাহায্য করবে।

তায়েফে অভিজাত শ্রেণীর বাস। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী ছিল আব্দে ইয়ালীল, মাসউদ এবং হাবীব নামে তিন ভাই। তাদের কাছে যখন সত্যের বাণী পৌঁছালেন তখন তারা তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া নবী করার মত উপযুক্ত লোক আর খুঁজে পেলেন না?

এ ছাড়া আরো নানান্ ধরনের টিট্‌কারী দিল। শেষে নবীজীকে তায়েফ শহর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। এতেও তাদের তৃপ্তি হলো না। তারা কি করল জানো ? রাস্তার বখাটে ছেলেদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। ঠিক যেমন পাগল, বা চোর-বদমায়েশের পেছনে লেলিয়ে দেয়। তাদের হৈ-হল্লা আর চিৎকারে দেখতে দেখতে রাস্তায় ভিড় জমে গেল। পথের দু'ধার থেকে মুষলধারায় পাথর-বৃষ্টি হতে লাগলো। সেই সাথে অকথ্য গালাগালি। আর তারি মাঝখান দিয়ে আহা! আল্লাহ্‌র নবী পথ চলতে লাগলেন। সারা শরীর তাঁর পাথরের ঘায়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। দেহ অবসন্ন হয়ে এলো! তিনি পথের মাঝে বসে পড়লেন। কিন্তু জালিমরা, সত্যের দুশমনরা তাঁকে বসতে দিল না। জোর করে উঠিয়ে দিল। তিনি চলতে শুরু করলে আবার পাথর ছোঁড়া শুরু হলো। উঃ! কি পৈশাচিক দৃশ্য! নবীজীকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর সহচর হযরত যায়েদ বিন্ হারিছও মারাত্মকভাবে জখম হলেন। তাঁর মাথা দিয়ে দরদর ধারায় খুন বের হতে লাগলো। অবশেষে তাদের এলাকা যখন পার হয়ে এলেন তখন আর চলার শক্তি নেই। পথের ধারে একটা ছায়াঘেরা আঙ্গুর বাগানে এসে নবীজী বসে পড়লেন।

এই বাগানটা ছিল ওত্‌বা আর শায়বা নামে দুই ভাইয়ের। তারা ছিল খৃস্টান। হযরতের এই অবস্থা দেখে তাদের মন দয়ায় গলে গেল। তারা তাদের ক্রীতদাস আদ্দাসকে একছড়া আঙ্গুর পেড়ে দিতে বলল। রাসূলুল্লাহ 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে আঙ্গুর মুখে দিলেন। আদ্দাস অবাক হলো। সে নবীজীর পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো যে, তিনি মক্কার বাসিন্দা। তিনি ইউনুস (আ), ইউসুফ (আ) ও ঈসা (আ)-এর মত আল্লাহ্‌র নবী। তখনই সে পরম ভক্তি ভরে তাঁর পবিত্র হাতে, পায়ে, মাথায় চুমা দিয়ে ইসলাম কবুল করল। তাই না দেখে তার মনিবের কি গালাগালি। একটা পাগলের হাতে-পায়ে কিনা সে চুমা খাচ্ছে ? কিন্তু হযরতের পবিত্র পরশে আদ্দাসের তখন রূপান্তর ঘটেছে। পবিত্র নূরের আলোয় তার অন্তর আলোকিত। সে গালাগালিতে কর্ণপাত না করে বলল, তাঁর মত নেক লোক এই দুনিয়ায় আর দু'টো নেই। তিনি আমাকে এমন এক খবর দিয়েছেন, যা নবী ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।

যাই হোক, তায়েফের পথ ছেড়ে চলে আসার আগে নবীজী আল্লাহ পাকের দরবারে দু'হাত তুলে অশ্রু বিগলিত চিত্তে এই বলে দোয়া করেছিলেন, আয় আল্লাহ! আমার এই যে অবস্থা এর জন্যে আমি তোমার কাছেই ফরিয়াদ জানাচ্ছি। হে আমার রব! যারা দুর্বল তাদের সবারই প্রতিপালক তুমি! তুমি তো আমারও প্রতিপালক! তুমি আমাকে কার হাতে অর্পণ করেছ ? যে নির্দয় দুশমন আমাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করবে তার হাতে ? না, যে হৃদয়বান বন্ধু আমার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে, আমাকে শান্তিদান করবে তার হাতে ? হে আমার পরওয়ারদিগার! যদি তুমি আমার উপর রাগ না করে থাকো, যদি আমার উপর নাখোশ না হয়ে থাকো, তাহলে আমি কোন কিছুই পরওয়া করি না। হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্র সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে নূরে আসমান ও জমিন আলোকিত হয়েছে, যে নূরে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেছে, যে নূরে সব কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে, সেই পবিত্র নূরের উসিলায় তুমি আমার উপর গজব নাজিল করো না। হে আল্লাহ!

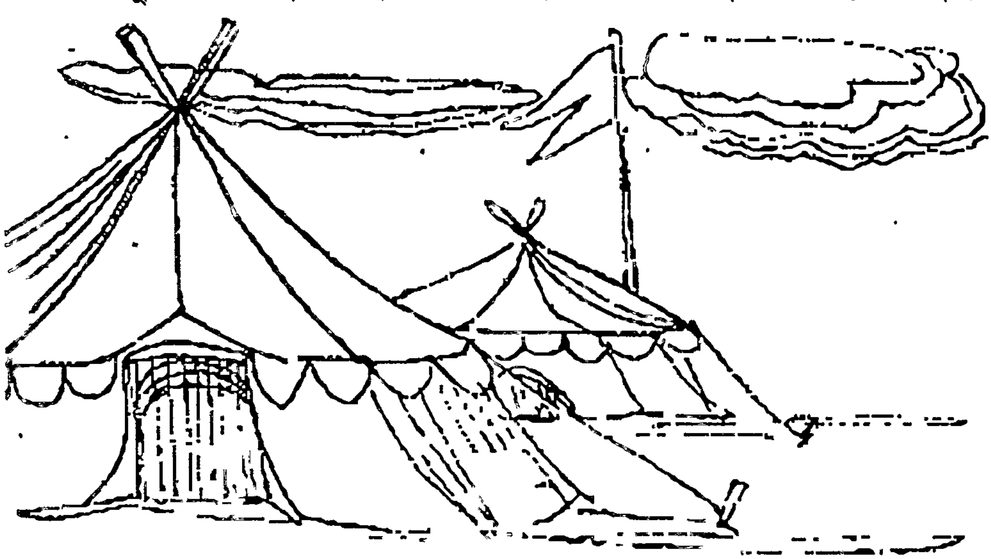
তুমি আমার প্রতি নাখোশ হয়ো না। আয় আল্লাহ! তোমার সাহায্য ছাড়া গোনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন শক্তিই আমার নেই।'

মুনাজাত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ফেরেশ্তা হযরত জিবরাইল (আ) এসে হাজির। তিনি সালাম জানিয়ে বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার কথা শুনেছেন। আপনার প্রতি তায়েফবাসীরা যে অত্যাচার করেছে তাও তিনি দেখেছেন। আল্লাহ্ এক ফেরেশ্তাকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি যদি হুকুম করেন, তাহলে এখুনি সমগ্র তায়েফকে সে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে। জবাবে আমাদের নবীজী কি বললেন জানো ? বললেন, না-না, তারা ধ্বংস হোক এ আমি চাই না। আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে মাফ চাইছি। কেননা আল্লাহ্ হয় তো তাদের বংশে এমন মানুষের জন্ম দেবেন, যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করবে না।'

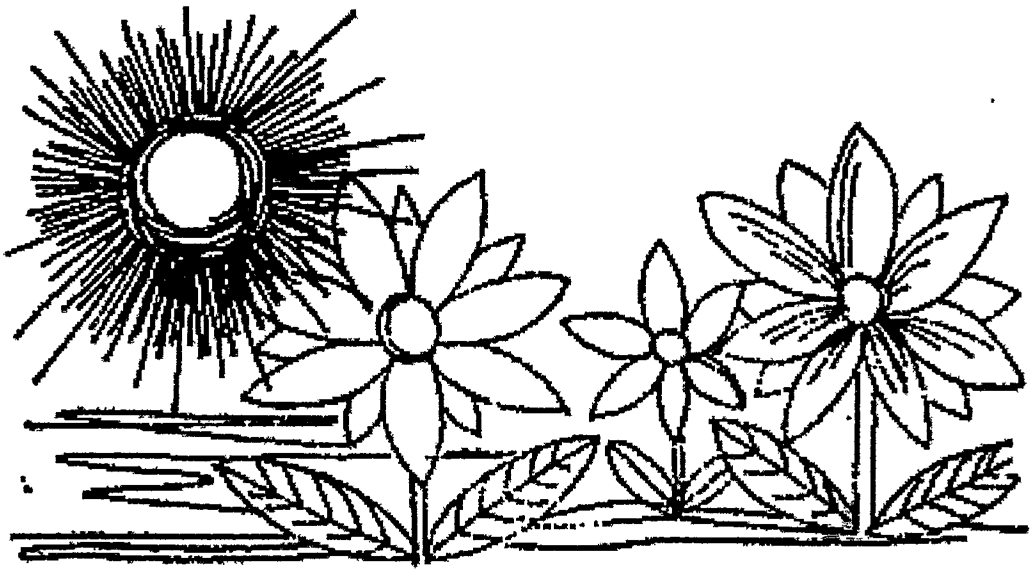
ক্ষমার এমন দৃষ্টান্ত মানুষের ইতিহাসে আর নেই। তায়েফের পথে তাঁর ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল, ওহুদের যুদ্ধেও তাঁকে এত অত্যাচার সইতে হয়নি। তবু তিনি তাঁদের ক্ষমা করেছেন। এ জন্যেই তো তিনি রহ্মাতুল্লিল আলামীন।

নবী করীম (সা) আবার ফিরে এলেন মক্কায়। এ মক্কা যেন তাঁর সেই প্রিয় জন্মভূমি চির পরিচিত মক্কা নয়। এ যেন আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়-পরিজনহীন অন্য এক দেশ। যেখানে তাঁর পরম স্নেহময় চাচা, দুর্দিনের আশ্রয়দাতা আবূ তালিব নেই। নেই সেই দুঃখের দিনের একমাত্র সান্ত্বনা-দায়িনী বিবি খাদিজা। যে দিকে তাকান শুধু শত্রু আর শত্রু। বন্ধু কই ? কোথায় উঠবেন ? কার আশ্রয়ে থাকবেন, ভেবে পান না। শেষে মক্কা শহরের নামকরা এক নেতা মোতয়েম ইব্নে আদীর সাহায্য চাইলেন। হযরতের অসহায় অবস্থা দেখে মোতয়েমের অন্তর ব্যথিত হলো। তিনি তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলেন এবং ঘোষণা করলেন, আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় দিলাম।

নবীজী কিছুদিনের জন্য ইসলাম প্রচারের কাজ বন্ধ রাখলেন। দেহে মনে তাঁর ক্লান্তির ছায়া।



আঠারো



নবুওতের দশ বছর। রজব মাস। ৬২০ খৃস্টাব্দ। হজ্জ এবং ব্যবসা উপলক্ষে মদীনা থেকে ছ'জন সম্ভ্রান্ত লোক মক্কায় এসেছিলেন। নবীজীর কথা এরা আগেই শুনেছিলেন। নবীর সাথে তাদের সাক্ষাত হলো। তারা শুনলেন তাঁর মধুর কণ্ঠের অমিয় বাণী, আল্লাহ্‌র কালাম। রাসূলুল্লাহ্‌র মধুর ব্যবহার, চরিত্র-মাধুর্য ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হলেন এবং পবিত্র কলেমা পড়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তারপর মদীনায় ফিরে গিয়ে সত্য-ধর্ম প্রচারক, শান্তির বাণীবাহক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিষয়ে মদীনাবাসীকে জানালেন। ৬২১ খৃস্টাব্দে মদীনা থেকে আরো বারোজন লোক মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নবীজীর কাছে একজন ইসলাম প্রচারক চাইলেন। ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ বা প্রচারক হিসেবে নবীজী মাসয়াব (রা) নামে একজন সাহাবাকে তাদের সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। মদীনার পথে পথে এবার ফুটে উঠতে লাগলো আলোর ফুল, জ্বলে উঠতে লাগলো সত্যের দীপশিখা। মক্কার কঠিন মরু যার শিকড় গজাতে দেয় নি—মদীনার কোমল মাটি তাকে বুকে নিয়ে পত্রে-পুষ্পে বিকশিত করে তুলতে লাগলো।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। রাসূলুল্লাহ্‌র জন্যে, ইসলামের জন্যে তাঁর ত্যাগের তুলনা হয় না। তিনিই ছিলেন তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী; চির সহচর। ইসলামের খেদমতে নও-মুসলিমদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্‌র পথে তিনি নিজের আরাম-আয়েশ-ধন-দৌলত সমস্তই বিসর্জন দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলে করীম (সা) যখন বিবি খাদিজাকে হারিয়ে একেবারে একা– তাঁর দেখাশোনা করার কেউ ছিল না– তখন হযরত আবূ বকর তাঁর নিজের কন্যা বিবি আয়েশাকে নবীজীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বিবি

আয়েশা (রা) ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি গুণবতী ও বিদুষী। পরবর্তীকালে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছ থেকেই নবীজীর জীবনযাত্রা, তাঁর কথা, তাঁর কাজ, তাঁর আদেশ-নিষেধ সংগ্রহ করে সংকলন করা হয়েছে। যেগুলোকে আমরা 'হাদীস' বলে থাকি। কোন হাদীসের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য হাদীস সংগ্রহকারী অধিকাংশ সময় তাঁরই শরণাপন্ন হতেন।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) আল্লাহ্র নবী হলেও তিনি ছিলেন রক্ত-মাংসের মানুষ। দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী ব্যথা–বেদনা, সুখ-দুঃখ তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। সহ্য করতে হয়েছিল সত্যের জন্যে অমানুষিক নির্যাতন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ব্যথা-বেদনার কষ্টি-পাথরে ঘষে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছিলেন। কঠিন থেকে কঠিনতম ধৈর্যের পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। তারপর এসেছিল তাঁর নেয়ামত, তাঁর রহমত, তাঁর পরিপূর্ণ স্বীকৃতি। হতে পেরেছিলেন আল্লাহ্র প্রিয় মাহবুব এবং বন্ধু হিসেবে বন্ধুর সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন মহান 'মি'রাজ'-এর মধ্য দিয়ে। মাটির মানুষের জন্যে এ এক মহান বিজয়। যা আর কোন নবীর ভাগ্যে ঘটেনি। এবার সেই পবিত্র মি'রাজের কথা বলব।

নবুওত লাভের দশ ও এগার বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটনা ঘটে। মি'রাজের ঘটনা মানুষের কাছে এক মহা বিস্ময়ের ব্যাপার। দীন-দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্ পাক এই মি'রাজের মাধ্যমে মানুষকে দেওয়া তাঁর অসীম ক্ষমতা দেখিয়েছেন। অবিশ্বাসী মানুষকে দেখিয়েছেন তাঁর সৃষ্টি-রহস্য, তাঁর কুদরতের নমুনা। সন্ধান দিয়েছেন তাঁকে পাওয়ার পথ। রজব মাসের সাতাশ তারিখ সোমবারের রাত। হযরত রাসূলে করীম (সা) বিবি উম্মে হানীর ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। তখন গভীর রাত। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। এমন সময় কিসের যেন শব্দে হযরতের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখলেন– দরজায় দাঁড়িয়ে ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম। সঙ্গে বেহেশ্তের বাহক বোরাক। বোরাকের কাল্পনিক ছবি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। মুখের দিকটা যার স্ত্রীলোকের মত আর বাকি শরীর ঘোড়ার মত। পিঠের দু'দিকে পাখির ডানার মত মস্ত বড় সুন্দর ডানা। এই বোরাকের গতি বিদ্যুতের মত। চোখের পলকে দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যেতে পারে।

জিবরাইল (আ) নবী করীম (সা)-কে সালাম জানিয়ে আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভের দাওয়াত জানালেন এবং বললেন– আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বোরাক দাঁড়িয়ে আছে। হযরত বোরাকে সওয়ার হলেন। তাঁকে নিয়ে জিব্রাইল (আ) প্রথমে জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাসে গেলেন। সেখানে তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষাত পেলেন এবং তাঁদের সাথে একত্রে নামায আদায় করলেন। তারপর জিব্রাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে নূরের সিঁড়ি বেয়ে তিনি উপরে উঠে গেলেন। জিব্রাইল (আ) তাঁকে পুণ্যবানদের জন্যে আখিরাতের পুরস্কার বেহেশ্ত আর অত্যাচারী ও পাপীদের জন্য দোজখের শাস্তির কি কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তার সব নমুনা দেখালেন। সে সব শাস্তির কথা শুনলে শরীর শিউরে উঠবে। মনে হবে, সারা জীবনে আর কোন অন্যায় কাজ করব না। তার কয়েকটা তোমরাও শুনে রাখো।

এক জায়গায় নবী করীম (সা) দেখলেন,–একদল লোকের মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার আপনাআপনি জোড়া লেগে যাচ্ছে। আবার পাথর মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনবরত এভাবে শাস্তি দেওয়া চলছে। তিনি এদের পরিচয় জানতে চাইলেন। জিব্‌রাইল (আ) বললেন,– এরা ফরজ নামায আদায় করত না। চলতে চলতে আর এক জায়গায় দেখলেন,–একদল লোকের পরনে রয়েছে এক টুকরা ছেঁড়া কাপড়। তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের মত চরে বেড়াচ্ছে আর কাঁটায় ভরা 'জাক্কুম' ও 'দারী' নামক বিষাক্ত গাছ চিবিয়ে খাচ্ছে। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিব্‌রাইল (আ) জানালেন,– আল্লাহ্ এদের ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা মালের যাকাত দিত না।

সেখান থেকে আবার একটু অগ্রসর হয়ে দেখলেন,– আর একদল লোক পচা, দুর্গন্ধ আর কাঁচা গোশ্‌ত খাচ্ছে। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে জিব্‌রাইল (আ) বললেন,– এরা ছিল অসৎ চরিত্রের লোক। হালাল জিনিস থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে হারাম খেত এবং হারাম সংস্পর্শে থাকতো।

আবার সামনে আর একটু অগ্রসর হতেই দেখলেন, একটা লোক রক্তের নদী সাঁতার দিচ্ছে আর ক্ষুধার্ত মানুষের মত গিলে গিলে পাথর খাচ্ছে। নবীজী বিস্মিত চোখে তাকাতেই জিব্‌রাইল (আ) বললেন,– এরা হচ্ছে সুদখোর। সুদের বদলে এরা মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দিত।

তারপর আবার চলতে চলতে দেখলেন,– একদল লোকের জিভ আর ঠোঁট গরম লোহার কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। কাটার পরেই আবার তা গজাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার কেটে দেওয়া হচ্ছে। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন,– এঁরা কা'রা ? জিব্‌রাইল (আ) বললেন,– এরা ঐসব বক্তা যারা দুনিয়াতে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে ভুল পথে চালাতো, দলে দলে ঝগড়া-বিবাদ বাধাত এবং নিজেরা মুখে যা বলতো কাজে তা করতো না।

নবীজী সেখান থেকে আবার আগে চললেন। এবার আবার এক জায়গায় দেখলেন,– একদল লোকের নখ হয়েছে তামার। আর সেই নখ দিয়ে তারা নিজেদের বুক আর মুখ আঁচড়ে রক্ত বের করছে। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন,–এরা এমন করছে কেন ? জিব্‌রাইল (আ) জবাব দিলেন,–এরা দুনিয়ায় থাকতে কেবল পরের দোষ খুঁজে বেড়াতো আর শুধু পর-নিন্দা ও পর-চর্চায় মেতে থাকতো।

তারপর একটা প্রান্তর অতিক্রম করার সময় খোশবুদার ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তাঁর শরীর মন জুড়িয়ে দিল। কানে ভেসে এলো কার যেন আকুল আহবান। 'হায় আল্লাহ! আমাকে যা ওয়াদা করেছ তা দাও। দাও আমার এই প্রাচুর্য ভোগের বাসিন্দা।'

নবীজী জিজ্ঞেস করলেন,– এ কার আওয়াজ ?

– বেহেশ্‌তের। জবাব দিলেন জিব্‌রাইল (আ)।

পরক্ষণেই শুনলেন গায়েবী আওয়াজ আল্লাহ্‌র–

– 'ধৈর্য ধর। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, প্রত্যেক ঈমানদার বান্দা, যারা আমার সাথে আর কারো শরীক না করবে, আমাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে মানবে, তাদের সবাইকে আমি তোমার জন্যে ঠিক করে রেখেছি।'

'যে আমাকে ভয় করবে সে বিপদমুক্ত থাকবে। যে আমাকে ঋণ দেবে আমি তাকে প্রতিদান দেব। আর সুখে-দুঃখে যে আমার উপরে ভরসা করবে আমি তার জন্যে যথেষ্ট হব। আমি আল্লাহ্। আমি ছাড়া কারো আর কোন মা'বুদ নাই। আর আমি কখনও আমার ওয়াদা ভঙ্গ করি না। নিশ্চয়ই ঈমানদারেরা কামিয়াব হবে এবং আল্লাহ্ পবিত্র ও উত্তম স্রষ্টা।' বেহেশ্ত আশ্বস্ত হলো। ঠিক এমনিভাবে ক্ষুধার্ত দোজখের আহ্বান শুনলেন। শুনলেন আল্লাহ্ পাকের গায়েবী আওয়াজ। 'প্রত্যেক অবিশ্বাসী নর-নারী, যারা আখিরাতে—কিয়ামতের দিনে তাদের কাজের হিসাব-নিকাশ দেওয়াকে বিশ্বাস করে না; যারা বে-ঈমান, অহংকারী এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে,–তাদের সবাইকে আমি তোমার জন্যে ঠিক করে রেখেছি।' এ কথায় দোজখও আশ্বস্ত হলো।

উপরে পর পর সাতটি আসমান। প্রত্যেক আসমানে আছেন এক একজন পাহারাদার ফেরেশ্তা। নবীজী প্রথম আসমান অতিক্রম করার সময় হযরত আদম (আ) তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত ঈসা (আ), তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ), চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরিস (আ), পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আ), ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ) এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাত পেলেন। প্রত্যেকেই 'মারহাবা ইয়া মুহাম্মদ', 'মানবকুলের গৌরব' 'মুহাম্মদ' বলে খোশ আমদেদ জানালেন এবং নিজেদের পরিচয় দিলেন। নবীজী তাঁদের প্রত্যেকের সাথে আলাপ করলেন এবং উপদেশ নিলেন।

তারপর জিব্রাইল (আ) নবী করীম (সা)-কে নিয়ে 'বায়তুল মা'মুরে' প্রবেশ করলেন। 'বায়তুল মা'মুর' বেহেশতের মসজিদ। এখানে ফেরেশ্তারা নামায আদায় করে থাকেন। বায়তুল মা'মুর ঠিক কা'বা শরীফের উপরে অবস্থিত। নবীজীও এখানে নামায আদায় করলেন।

এরপর হযরত জিব্রাইলের সাথে এলেন 'সিদরাতুল মুনতাহা' নামে এক জায়গায়। এখানে একটা কুলগাছ আছে। তার আকার কল্পনার বাইরে। সেই কুলগাছই 'সিদরাতুল মুনতাহা' অর্থাৎ সীমান্তের কুলগাছ। সৃষ্টি ও স্রষ্টার যে এলাকা, তার সীমারেখা। এর ওপরে আর কারো যাওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্ কাউকে দেন নি। ফেরেশ্তাদেরও নয়।

জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম এখানে এসে রাসূলুল্লাহ্কে বললেন– আর আমার যাওয়ার ক্ষমতা নেই। এবার আপনাকে একাই যেতে হবে। এরপর 'রফ্রফ্' নামে জ্যোতির্ময় একটা আসন নেমে এলো– নবীজীকে নিয়ে গেল উপরে। নূরের নবী চলে গেলেন নূরের রাজ্যে। যেখানে ধ্বনিত হলো 'আল্লাহু আকবর'! প্রতিধ্বনিত হলো,–আমার বান্দা ঠিকই বলেছে—আমি সর্বাপেক্ষা মহান! 'আশহাদু-আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।' আওয়াজ এলো,–আমার বান্দা ঠিকই বলেছে– আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মা'বুদ নেই। আবার ধ্বনিত হলো–আশহাদু-আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। প্রতিধ্বনি ফিরে এলো–'আমার বান্দা সত্যিই বলেছে–আমিই মুহাম্মদকে পাঠিয়েছি।'

তারপর নূরনবী, মানুষের নবী, সৃষ্টির সেরা জন, আল্লাহ্র প্রিয় মাহবুব আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করলেন। তাঁর প্রিয় উম্মতদের জন্য আল্লাহ্ পাকের কাছ থেকে বেহেশ্তের সওগাত পাঁচ ওয়াক্ত

নামাযের উপঢৌকন নিয়ে ফিরে এলেন আবার পাপে-তাপে ভরা মলিন মাটির ধূলায়। এই পবিত্র 'মি'রাজ' দীন ইসলামের ভিত্তিকে আরও মজবুত করেছে। এই দুনিয়ার সময়ের হিসেবে এই মি'রাজ এত কম সময়ের মধ্যে ঘটেছিল যে, অবিশ্বাসী কাফেররা এটাকে নিছক কাল্পনিক গালগল্প বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু যিনি আঁধারের মধ্য থেকে আলোক বের করেন, মরু মাটির বুক থেকে গাছ বের করেন– জীবিতকে মৃত, মৃতকে জীবিত করেন, মুহূর্তের মধ্যে শহর-নগর-জনপদ ধ্বংস করেন, মহাসমুদ্রের বুকে জনপদ সৃষ্টি করেন, মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কিছুই যে নেই,– এটা তারা বুঝে না, বুঝতে চায় না। মানুষ আল্লাহ্র খলীফা। সাধনার বলে যে কোথায় পৌঁছাতে পারে, আল্লাহ্ পাক এই ঘটনায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি মানব-মুকুট, মানবজাতির চিরকালের গৌরবের ধন।

যাই হোক– পরদিন সকালে আবূ জেহেলের সাথে রাসূলে আকরামের সাক্ষাত হতেই ঠাট্টার ছলে জিজ্ঞেস করল– কি হে মুহাম্মদ! নতুন কিছু শোনাবার মত আছে কি ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ! আছে। আজ রাতে আল্লাহ্ পাক আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আমি নামায আদায় করেছি।

আবূ জেহেল ও অন্যান্য সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মক্কা থেকে এক মাসের পথ জেরুজালেম। বলে কি না রাতের মধ্যে সেখানে গিয়ে ফিরে এসেছে ? সবাই হৈ চৈ বাধিয়ে দিলো। যারা পূর্বে নবীজীর উপর ঈমান এনেছিল তাঁদের মধ্যে যাদের ঈমান দুর্বল ছিল– তারাও এবার নবীজীকে পাগল বলেই সন্দেহ করলো। এ সন্দেহ শুধু তখন কেন এখনও একদল করে থাকে। চিরকাল এরা থাকবে– যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না, তাঁর শক্তির উপর আস্থা রাখে না, সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে তাকে ফুলের অর্ঘ্য দেয়। তাদের নেতার নীতি, তার পথ ও মতকে সঠিক মনে করে। আর আল্লাহ্র নবীকে মনে করে ভণ্ড, ধোঁকাবাজ, জাগতিক অগ্রগতির অন্তরায়। সবাই ছুটে গেল হযরত আবূ বকরের কাছে। বললো– তোমার প্রাণের বন্ধু মুহাম্মদ কি বলে শুনেছ ?

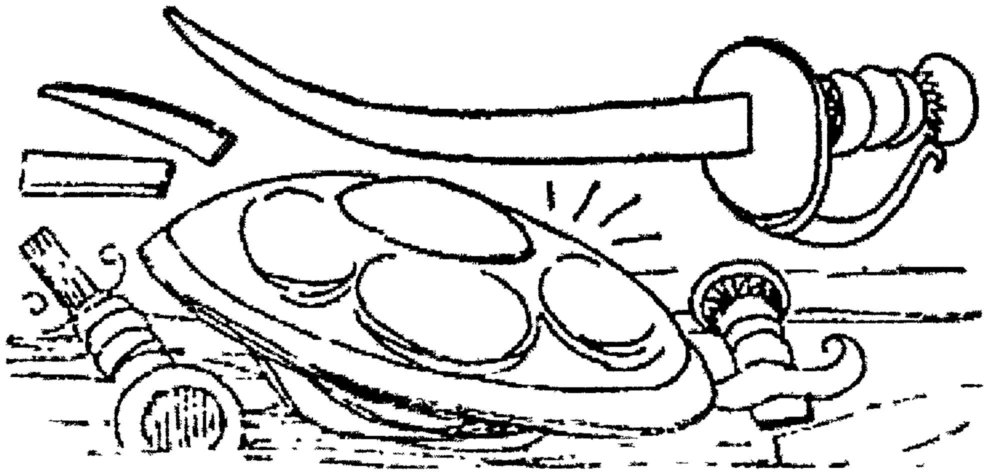
কি বলে ?

সে বলে যে, আজ রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে সে আবার ফিরে এসেছে।

হযরত আবূ বকর শুনে বললেন,– এতে অবিশ্বাসের কি আছে ? আল্লাহ্র কসম! তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন তা হলে আমি তা বিশ্বাস করি। তিনি ছুটে গেলেন নবীজীর কাছে। সব শুনে বললেন, আমি ঘোষণা করছি, তিনি যা বলেছেন সব সত্য। তারা বললো– ঠিক আছে, বলুন তো বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজা কয়টি ? কোন্ দরজা কোন্ খানে আর তার নকশাই বা কেমন ?

নবীজী এক এক করে বর্ণনা দিতে লাগলেন আর উপস্থিত জনতার মধ্যে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছিল তারা সত্য বলে সায় দিতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ এরপর হযরত আবূ বকরকে মি'রাজের বর্ণনা দিয়ে সুসংবাদ দিলেন– আয় আবূ বকর! আল্লাহ্ পাক তোমার উপাধি দিয়েছেন– সিদ্দীক। 'সিদ্দীক' মানে সত্যবাদী। শুধু সত্যবাদী নয়, সত্যকে যিনি সহজেই বিনা দ্বিধায় মেনে নেন, সত্যকে যিনি সহজেই বুঝতে পারেন। কথা এবং কাজে যিনি সত্যকে অনুসরণ করেন, তিনিই সিদ্দীক।

উনিশ



নবুওতের তেরো বছরে অর্থাৎ ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদীনা থেকে আরো ৭২ জন লোক মক্কায় এলেন। তাঁরা রাতের আঁধারে মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী 'আকাবা' নামে একটা পাহাড়ের আড়ালে নবী করীম (সা)-এর সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে মদীনায় যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন। সেখানে নবীজীর চাচা হযরত আব্বাসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন– দেখুন, আমরা দুশমনের হাত থেকে মুহাম্মদ (সা)-কে এতদিন রক্ষা করে আসছি। সব সময় তাঁকে চোখে চোখে রাখতে হয়। আপনারা যদি তাঁর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেও তাঁকে বিপদে-আপদে সাহায্য করতে রাজী থাকেন, তা হলে নিয়ে যেতে পারেন। আর তা যদি না পারেন তা হলে স্পষ্ট জবাব দিন।

তখন তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহুদীদের সাথে আমরা সন্ধিতে আবদ্ধ। আপনার হাতে বাইয়াত হলে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই আমরা জানতে চাই– আপনার দল যখন ভারী হবে, আপনার অনুসারীদের সংখ্যা যখন এখানে বেড়ে যাবে, তখন কি আমাদের ছেড়ে আপনি আপনার জন্মভূমি এই মক্কায় আবার ফিরে আসবেন ?

রাসূলে আকরাম (সা) অশ্রুভরা চোখে, দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন,– না। জেনে রাখো, তোমাদের রক্ত আমার রক্ত। আজ থেকে তোমরা আমার, আমিও তোমাদের।

তখন সকলে নবীজীর পবিত্র হাতে হাত রেখে শপথ নিল যে,– আমরা আজ থেকে আর

০ আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুর শরীক করব না।

০ চুরি করব না।

০ দরিদ্র হওয়ার ভয়ে সন্তানকে হত্যা করব না।

০ নারীদের বেইজ্জতী করব না।

০ কারো নামে কোন অপবাদ দেবো না আর পরনিন্দা করব না।

০ নেক কাজে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করব না।
০ সুখে-দুঃখে রাসূলুল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলব।
০ কোন বিষয় নিয়ে কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করব না।
০ সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্‌র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।

ইতিহাসে এই শপথকে– 'আকাবার শপথ' বলে। এঁদের ভিতর থেকে বারোজনকে রাসূলুল্লাহ্ 'নকীব' নিযুক্ত করে দিলেন। এঁদের মাধ্যমে, এই প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে মানুষ পেল সমাজ সংস্কারের এক নতুন মন্ত্র এবং এই মন্ত্রই আরব জাতিকে পাপ-কালিমার পূতি-গন্ধময় পাঁক থেকে উদ্ধার করল। এই শপথ মানুষের সাথে মানুষের মিলনের, পরস্পরকে একতার বন্ধনে বাঁধবার এক মজবুত সূত্র। অন্য দিকে অসহায় নারী জাতিকে অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে রক্ষার রক্ষা-কবচ।

সকাল হতেই খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। পৌত্তলিক কুরাইশরা গেল ভীষণ ক্ষেপে। মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা তাদের বেড়ে গেল। কোন উপায় না দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের সবাইকে মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনায় চলে যেতে পরামর্শ দিলেন। তাঁর পরামর্শ মত সবাই একে একে চলে গেল। মক্কায় রইলেন শুধু রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে, সুখ-দুঃখের সাথী হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত আলী (রা)।

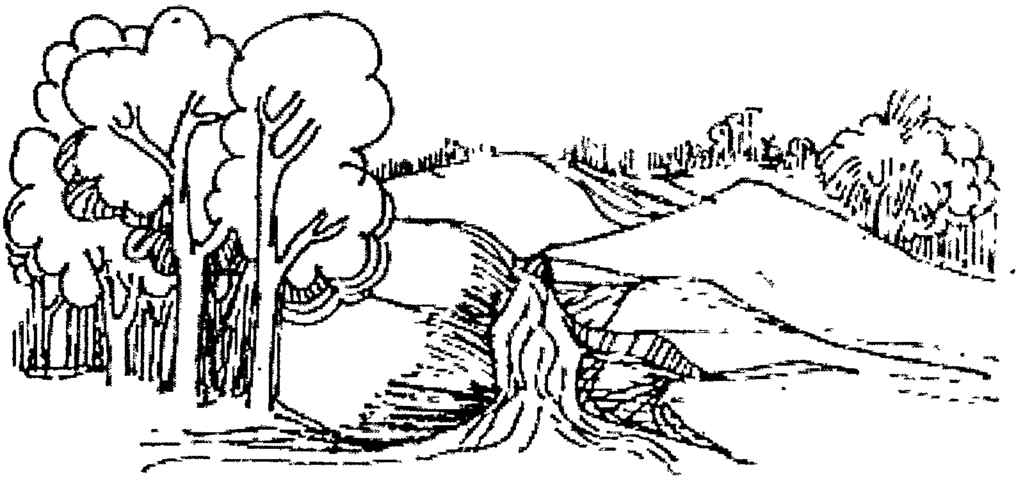
ইসলামের নতুন আলোর জোয়ারে মদীনা ভেসে উঠলো। দিকে দিকে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। তার ঢেউ এসে আঘাত হানলো মক্কায়। সর্বনাশ! এইবার বুঝি এই আলোর জোয়ারে মক্কাও ভেসে যায়। কুরাইশরা একত্র হলো দার-উন-নদওয়ার এক সভাগৃহে। মক্কার সব গোত্রের সর্দাররাও এসে হাজির হলো। আগুনঝরা বক্তৃতা দিয়ে বক্তারা শ্রোতাদের রক্তে আগুন ধরাতে লাগলো। তারা বলল,– মুহাম্মদ আমাদের বাপ-দাদার ধর্মকে, আমাদের পূর্বপুরুষের চিরাচরিত আদর্শকে, তাদের আচার-আচরণকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাদেরকে অপমান করছে, গালি দিচ্ছে। আমাদের দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। আর আমরা কাপুরুষের মত কি এ সব সহ্য করে যাবো?

– না, আর নয়। এর একটা প্রতিবিধান এখনই করতে হবে। এর মূল উপড়ে ফেলে দিতে হবে। নইলে সারা আরবে এ শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে আমাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে দেবে।

তখন কেউ বলল, মুহাম্মদকে ধরে সারা জীবন কয়েদখানায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হোক। কেউ বলল– না, দেশ থেকে বের করে দেওয়া হোক। কিন্তু এ পরামর্শ সবার মনের মত হলো না। শেষে ঠিক করা হলো তাঁকে হত্যাই করতে হবে। দুনিয়া থেকে তাঁর নামকে মুছে দিতে হবে। কিন্তু কে সে দুঃসাহসী? এমন কাজ কে করবে?

আবূ জেহেল তখন পরামর্শ দিল, এক কাজ করা যাক। প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সাহসী যুবক বেছে নিয়ে একটা দল তৈয়ার করা হোক। তাদের ওপর ভার দেওয়া হোক এই কাজের। তা হলে হাশেমী বংশের লোকেরা আর অস্ত্র ধরতে সাহস পাবে না। কথাটা সবারই মনে ধরলো। তখন নজদের শেখ নামধারী শয়তান আনন্দের সাথে প্রস্তাবটি সমর্থন করলো এবং উপস্থিত যুবকদের উত্তেজিত করে তুললো। তারা তখনই রাসূলে করীম (সা)-এর বাড়ি ঘেরাও করে পাহারা দিতে লাগলো। ঠিক হলো, সকাল বেলা যখনই তিনি ঘর থেকে বাইরে আসবেন তখনই তাঁকে হত্যা করা হবে।

কুড়ি



এ দিকে আমাদের নবীজী শয়তানদের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। তিনি হযরত আলী (রা)-কে ডেকে চুপি চুপি বললেন ঃ

–'আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আমার হিযরত করার হুকুম হয়েছে। সুতরাং আজ রাতেই আমি মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি। তুমি আমার বিছানায় আমার চাদর মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকো। আর এই সব মালপত্র রেখে গেলাম। এ গুলো প্রতিবেশীরা বিশ্বাস করে গচ্ছিত রেখেছিল, এ গুলোর প্রকৃত মালিক যে, তাদেরকে ডেকে ফিরিয়ে দিও।'

হযরত আলী নবীজীর কথা মত তাঁরই শয্যায় তাঁর পবিত্র চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। আর নবী করীম (সা) পেছনের জানালা দিয়ে অন্ধকারে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ভক্ত আলী (রা)-এর কি ভীষণ পরীক্ষা। এ শয্যা মৃত্যুশয্যার মত ভয়াবহ জেনেও স্বেচ্ছায় তা বরণ করে নিলেন। আল্লাহ্‌র নবীর জন্যে তাঁরা কি না করেছেন। নবীজী উপস্থিত হলেন হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাড়িতে। আবূ বকর (রা)-কে বললেন,– আমার প্রতি হিযরত করবার হুকুম হয়েছে। তিনি এই জন্যে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তখনই দুই সত্যসাধক, আপনা জন্মভূমি, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদ সব কিছু পেছনে ফেলে আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র পথে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন।

জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময় পবিত্র কা'বা ঘরের দিকে চেয়ে নবীজী অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন– বিদায় ! হে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা আমার, বিদায়! দুনিয়ার সকল জায়গার চেয়ে তুমি আমার প্রিয়! কিন্তু তোমার সন্তানরা আমাকে তোমার বুকে থাকতে দিল না। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি– তিনি তাঁর জন্মভূমিকে কত ভালবাসতেন। এ জন্যেই তিনি বলে গেছেন–দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। যে নিজের দেশকে ভালোবাসে না সে বে-ঈমান। পথ চলতে চলতে যখন রাত্রি শেষ হয়ে এলো, তখন তাঁরা 'ছওর' নামে একটা পাহাড়ের গুহায় ঢুকে আত্মগোপন করলেন। সেদিন ছিল সোমবার। ৬২২

খৃস্টাব্দ, জুলাই মাস। আর আরবী রবিউল আউয়াল মাসের ৪ তারিখ। সেই দিন থেকেই শুরু হয় দুনিয়ার ইতিহাসে হিজরী সন।

ওদিকে সারারাত বাড়ি পাহারা দিয়ে সকাল বেলা তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ্র শয্যায় হযরত আলী শুয়ে ছিলেন এবং তিনি বিছানায় নেই– তখন তারা উন্মাদের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তখনই ঢোল শহরত করে ঘোষণা দিলো, যে মুহাম্মদকে ধরে আনতে পারবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের লোভে দিকে দিকে হিংস্র হায়েনার মতো সব ছুটে চললো। কে আগে ধরে আনতে পারে। একশো উট পুরস্কার সোজা কথা নয়!

ওদিকে ছওর পাহাড়ের গুহায় হযরত আবূ বকর ঢুকে গুহার ভিতর পাহাড়ের গায়ে দেখলেন– ছোট ছোট অনেক গর্ত। ভিতরে বিষাক্ত পোকা-মাকড় থাকতে পারে ভেবে তিনি নিজের একখণ্ড বস্ত্র ছিঁড়ে গর্তগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে সময় পথের কষ্টে এত ক্লান্ত ছিলেন যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর জানুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ আবূ বকর (রা)-এর নজরে পড়লো পায়ের কাছে একটা গর্ত বন্ধ করা হয়নি। কাপড়ের টুকরা শেষ। যদি গর্তে কিছু থাকে ? যদি বের হয়ে নবীজীকে দংশন করে! এই ভেবে তিনি একটা পা দিয়ে গর্তের মুখটা চেপে ধরলেন। এই গর্তে সত্যি সত্যি ছিল একটা বিষাক্ত সাপ। সাপটা গর্ত থেকে বার বার বেরোবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পায়ে ছোবল মারতে লাগলো। বিষের যন্ত্রণায় হযরত আবূ বকর (রা) অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু নড়া-চড়া করলে পাছে নবীজীর ঘুম ভেঙে যায় তাই নীরবে সেই জ্বালা সহ্য করতে লাগলেন। নবীজীর পবিত্র মুখের উপর হঠাৎ তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা পড়তেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– কি হয়েছে আবূ বকর! কাঁদছো কেন ? আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে বোধ হয় সাপে কামড় দিয়েছে।

আমাকে ডাকো নি কেন ?

আপনি ক্লান্ত, তাই।

নবী করীম (সা) তখনই হযরত আবূ বকর (রা)-এর পায়ে যেখানে সাপে কামড়ে ছিল সেখানে তাঁর পবিত্র মুখের থুথু লাগিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ্র হুকুমে নিমেষের মধ্যে সেই জ্বালা-যন্ত্রণা সেরে গেল। আল্লাহ্র কুদরত! তিনি যাকে বাঁচান তাকে মারে কার সাধ্য! শত্রুরা চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছওর পাহাড়ের নিকট আসার পূর্বেই একটা বাবলা গাছ সেই গর্তের মুখে গজিয়ে মুখটা ঢেকে দিলো, আর দুটো বুনো পায়রা এসে সেই ডালে বাসা বেঁধে ডিম পেড়ে তা' দিতে লাগলো। আর সেখানে মাকড়সা এসে জাল তৈরি করল। খুঁজতে খুঁজতে এক সময়ে শত্রুর দল এসে দাঁড়ালো সেই গুহার সামনে। পায়ের দাগ পরীক্ষা করে তাদের একজন বললো, এই গুহাতেই আছে। কথাটা হযরত আবূ বকর (রা)-এর কানে যেতেই তিনি ভয়ে আঁতকে উঠলেন। এবার বুঝি প্রাণপ্রিয় নবীজীকে হারাতে হয়। হায় হায় কি হবে ? তিনি ভয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন–

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এবার কি হবে ? আমরা মাত্র দু'জন এখানে। আমি মরে গেলে কিছুই হবে না– কিন্তু আপনি গেলে দুনিয়া থেকে দীনের আলো, সত্যের আলো যে নিভে যাবে।

হযরত আবূ বকর (রা)-কে ভয় পেতে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সাহস দিলেন। বললেন, ভয় পেয়ো না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।

এই কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সমস্ত ভয় চলে গেল। আল্লাহ্র উপর যাদের বিশ্বাস আছে, তাদের এমনই হয়। তারাই পারে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের গান গাইতে, সত্যের বাণী শোনাতে। তাদের সাহায্যের জন্যে তৈরি থাকে অলক্ষ্যে আল্লাহ্র সৈনিক। দুশমনের দৃষ্টিকে তারা আচ্ছন্ন করে দিয়ে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাকে রক্ষা করে। তাই কুরাইশদের সেই লোকটার কথা অন্যেরা বিশ্বাস করলো না। বললো, এই গুহায় ঢুকলে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে যেত এবং পায়রার ডিমও ভেঙে যেত। কথাটা যুক্তিসংগত ভেবে দুশমনরা আর গুহার মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা না করে ফিরে গেল।

আল্লাহ্র অসীম কুদরতের মহিমা হযরত আবূ বকর প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেলেন। অন্তর তাঁর ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠলো। তাঁরা ছওর পর্বতের গুহায় তিনদিন তিন রাত কাটালেন। এই সময়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর বালক-পুত্র রাতে তাঁদের সাথে থাকতেন আর খুব ভোরে উঠে মক্কায় চলে যেতেন। দিনে কুরাইশদের আলাপ-আলোচনা শুনে এসে রাতে তাঁদেরকে জানাতেন। আর হযরত আবূ বকর (রা)-এর গোলাম রাতের আঁধারে বকরীর দুধ দিয়ে আসতেন।

তিন দিন পরে আবদুল্লাহ্ নামে এক বিশ্বাসী ভক্ত রাতের আঁধারে দুটো দ্রুতগামী উট নিয়ে গুহার কাছে হাজির হলেন। নবী করীম (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) সেই উটে চড়ে রওয়ানা হলেন দূর মদীনার পথে। সঙ্গে চললেন আরো দু'জন। আবূ বকর (রা)-এর গোলাম আর উষ্ট্রচালক ও পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ্ বিন আরীকত। ইনি ছিলেন বিধর্মী।

কোদাইদ নামে একটা জায়গা অতিক্রম করার সময় একজন অপরিচিত লোক তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। লোকটি মক্কায় আসছিল। মক্কায় এসে সে যখন শুনলো যে, মুহাম্মদ (সা)-এর হিজরত সম্পর্কে মুখে মুখে আলোচনা হচ্ছে, তখন সে বললো, আমি একটু আগেই ছোট্ট একটা কাফেলাকে যেতে দেখেছি। আমার মনে হয়, তোমরা যাকে খুঁজছো এ কাফেলা তাদেরই। সংবাদটা শুনেই সোরাকা নামে একজন চতুর কুরাইশ সর্দার চুপি চুপি একটা তেজী অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে সে দেখতে পেল, সত্যি সত্যি রাসূলে করীম (সা)-এর কাফেলা যাচ্ছে। তখন সে আরো দ্রুত ঘোড়া ছুটালো। তার আর তর সইছে না। কিন্তু হঠাৎ হোঁচট খেয়ে ঘোড়াটা মাটিতে পড়ে গেল। বাধা পেয়ে তার উৎসাহ একটু দমে গেল। এমন হলো কেন ? উঠে আবার অশ্বকে ছুটালো। যখন প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে– তখন হযরত আবূ বকর সোরাকাকে দেখতে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আর রক্ষা নেই। ঐ দেখুন, কে যেন আসছে। এক্ষুণি আমাদের ধরে ফেলবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) শান্ত কণ্ঠে বললেন, না, সে ধরতে পারবে না।

সোরাকা দূর থেকে চিৎকার করে বলল, মুহাম্মদ! এবার কে তোমায় রক্ষা করবে ?

বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি জবাব দিলেন—আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহু।

এই বলে তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাত উঠালেন। মুনাজাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে সোরাকার ঘোড়ার সামনের পা দু'টি বালির মধ্যে পুঁতে গেল। সোরাকা পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। বহু চেষ্টা করেও ঘোড়ার পা আর উঠানো গেল না। সোরাকার মন তখন অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলো। সে আল্লাহ্র নবীর কাছে ক্ষমা চাইলো। বলল, আপনি দোয়া করুন, ঘোড়াটা যেন এই বিপদ থেকে মুক্তি পায়। নবীজী পুনরায় দোয়া করতেই ঘোড়ার পা দু'টি মুক্ত হয়ে গেলো। সোরাকা তখন কুরাইশদের ঘোষণার কথা নবীজীকে জানালো এবং প্রতিজ্ঞা করল যে, নবীজীর গতিবিধির কথা সে সবার কাছেই গোপন রাখবে। আল্লাহ্র কুদরতে শত্রু সোরাকা মিত্রে পরিণত হলো। আঁধার হৃদয়ে তার জ্বলে উঠলো সত্যের আলো। সেই আলোর পথ ধরে সে মক্কায় ফিরে গেল। ফিরে গেল নবীজীর দোয়া মাথায় নিয়ে।

তারপর! নবীজীর কাফেলা ছুটে চললো আবার। রাত গেলো, দিন এলো। আবার রাত এলো। মাথার ওপরে তারা-ভরা আসমান—নিচে ধুধু মরুর বালি। কোথাও জনবসতি নেই। আহা! তারই মাঝ দিয়ে চলেছেন সত্যের বাণীবাহক আল্লাহ্র নবী, নিপীড়িত নিখিলের আপন জন, আজকের প্রায় ১২০ কোটি মুসলমানের মাথার মণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)। জন্মভূমি ছেড়ে, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে– নিঃসহায় অবস্থায়। সত্যের জন্যে, আলোর জন্যে, শান্তির জন্যে।



একুশ



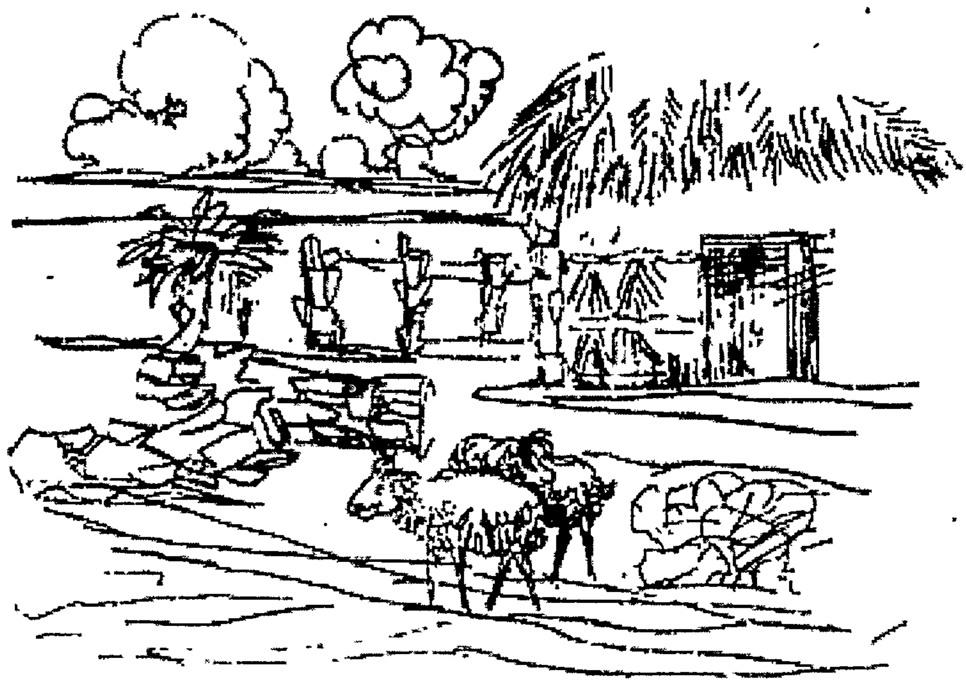
নূরনবী (সা) মদীনার এক ক্রোশ দূরে কোবা নামে এক জায়গায় এসে থামলেন। এখানে সায়েদ বিন্ খায়সমার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। নামায আদায়ের জন্যে সর্বপ্রথম তিনি এখানে একটা মসজিদ নির্মাণ করলেন। সেই মসজিদই আজ 'কোবার মসজিদ' নামে খ্যাত। কয়েকদিন পর হযরত আলী (রা)-ও তাঁদের সাথে এসে মিলিত হলেন। চারদিন পর, ১২ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার রাসূলে করীম (সা) মদীনায় প্রবেশ করলেন। দুনিয়ার ইতিহাসে অখ্যাত ইয়াসরিব, সেই দিন থেকে হলো 'মদীনাতুন্নবী' বা নবীনগরী। মদীনা মুনাওয়ারা বা আলোক নগরী। আর নবীজী হলেন সেই দিন থেকে 'শাহে মদীনা'।

মদীনায় রাসূলের আসার খবর বিদ্যুৎগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। রূপকথার যে নায়কের কথা, শান্তির যে দূতের কথা, যে অলৌকিক মহাপুরুষের কথা তারা এতদিন শুনে আসছিল– যাঁকে এক নজর দেখার জন্যে নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ-যুবা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তাঁর আসার খবরে তারা উন্মত্ত পতঙ্গের মত দলে দলে ছুটে বেরিয়ে এলো পথে। কণ্ঠে তাদের আনন্দের সুর বেজে উঠল ঃ

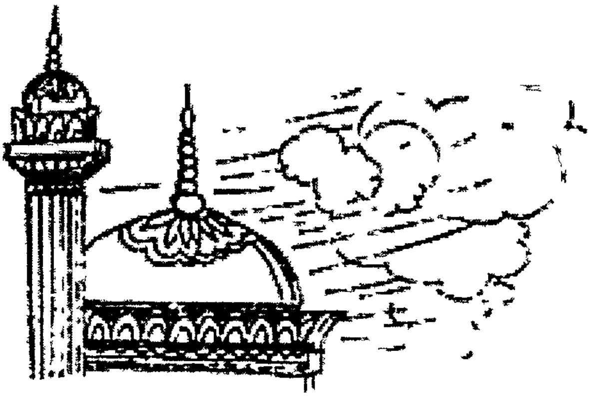
ছানিয়াতুল বেদা হতে
পূর্ণ চাঁদের উদয় হল ভাই,
আঁধার যে আর নাই–
(এই) শুভ দিনের নেয়ামতের
শোকর করা চাই ॥
ওরে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাত
উঠবে যত কাল–
শোকর সবাই করব আদায়
ধরায় তত কাল।
লাখ দরূদের ফুলকলি তাই
ছড়িয়ে দিয়ে যাই ॥

মোদের তরে এলে তুমি
করো হুকুম জারী,
জীবন দিয়ে করব মোরা
তোমার তাঁবেদারী–
খোদার হাবীব রসূল তুমি
সন্দেহ যে নাই ॥

হযরত উটের পিঠে সওয়ার হয়ে পথের দু'ধারে জনতার সালাম নিতে নিতে এগিয়ে চললেন। সবাই চায় তাঁকে নিজের মেহমানরূপে পেতে। সবাই চায় নবী করীম (সা) যেন তার বাড়িতে ওঠেন। নবীজী কার মন রাখবেন ? তিনি যে সবার, সবাই যে তাঁর। তিনি তখন উটের লাগাম ছেড়ে দিয়ে বললেন, এই উট যেখানে গিয়ে নিজেই বসে পড়বে, আমি সেখানেই থাকবো। অবশেষে সত্যি সত্যি তাঁর উট একজন গরীব গৃহস্থের বাড়ির কাছে গিয়ে বসে পড়লো। তাঁর নাম আবূ আইয়ুব আনসারী। খুশিতে তিনি ছুটে এসে নবীজীর মাল-পত্তর নিয়ে নিজের ঘরে তুললেন। তাজীমের সাথে বিশ্বনবীকে তাঁর ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। তীর্থ হলো তাঁর ঘর। ধন্য হলো তাঁর জীবন।



বাইশ



ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে, সব মুসলমানের একত্রে মিলিত হওয়ার জন্যে, একত্রে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্যে, পবিত্র মিলনকেন্দ্র মসজিদের প্রয়োজন দেখা দিল। যেখানে নবীজীর উট বসে পড়েছিল, সেই জায়গাতেই তৈরি হলো ইসলামের প্রথম মসজিদ। মসজিদে নববী। নবীর মসজিদ। এই মসজিদের জমির জন্যে টাকা দিয়েছিলেন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী। আর সাহাবীরা সকলে নিজের হাতে গেঁথেছিলেন এই মসজিদের দেওয়াল। দীন-দুনিয়ার বাদশাহ্ রাসূলে আকরাম (সা) নিজে দিনমজুরের মত সবার সাথে এই মসজিদ নির্মাণের সময় কাজ করেছিলেন। পবিত্র মাথায় ইট বয়েছিলেন। কোন কাজকেই তিনি ছোট মনে করতেন না। পরবর্তীকালে এই মসজিদই হয়েছিল ইসলামের প্রধান কেন্দ্র। সমস্ত আরব আর অর্ধেক দুনিয়ার শাসন কাজ পরিচালিত হতো, ফরমান জারি হতো এখান থেকে। এই মসজিদের পাশেই পরে তৈরি হয়েছিল হযরতের পরিজনবর্গের জন্যে থাকার ঘর।

যাই হোক– মসজিদ তো হলো। কিন্তু মানুষকে নামাযের জন্যে এক সাথে জমায়েত করা যায় কি করে? বাড়ি গিয়ে প্রতিদিন পাঁচবার ডেকে আনা এক ঝামেলা। রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। একজন বললেন, নামাযের সময় একটা নিশান উঁচুতে উঠিয়ে দিলে সবাই বুঝতে পারবে যে, নামাযের সময় হয়েছে।

আর একজন বললেন, তার চেয়ে শিঙায় 'ফুঁ' দিলে সবাই শুনতে পাবে। কেউ বললেন, না না, ঘণ্টা বাজানো হোক। না হয় আগুন জ্বালানো হোক।

রাসূলে আকরাম (সা) কোনটাই মেনে নিতে পারলেন না। কারণ ইহুদীরা শিঙায় ফুঁ দেয়, নাসারারা ঘণ্টা বাজায় আর অগ্নি উপাসকরা আগুন জ্বালায়। শেষে হযরত উমর (রা) বললেন, নামাযের সময় সবাইকে ডাকার জন্যে একজন লোক ঠিক করা হোক। কথাটা সবাই মেনে নিলেন এবং হযরত বেলালের ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া হলো। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত মধুর। নামাযের সময় হলে তিনি শুধু এই বলে ডাকতেন, আচ্ছালাতু জামেয়াতুন অর্থাৎ নামাযের সময় হয়েছে।

এভাবে কিছুদিন চললো। একদিন ভোর রাতে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদ (রা) খাবে দেখলেন, খুব শানদার সবুজ পোশাক পরা একজন বুযুর্গ তাঁকে বলছেন, নামাযে লোক জমায়েত

করার জন্যে সবচেয়ে ভালো একটা উপায় তোমাকে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি আযানের সুরে উচ্চারণ করলেন– আল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। ভোর হতেই আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদ দৌড়ে গেলেন নবীজীর কাছে। খাবের বিষয় জানালেন। নবীজী বললেন, এ খাব সত্য। তুমি বেলালকে এটা শিখিয়ে দাও।

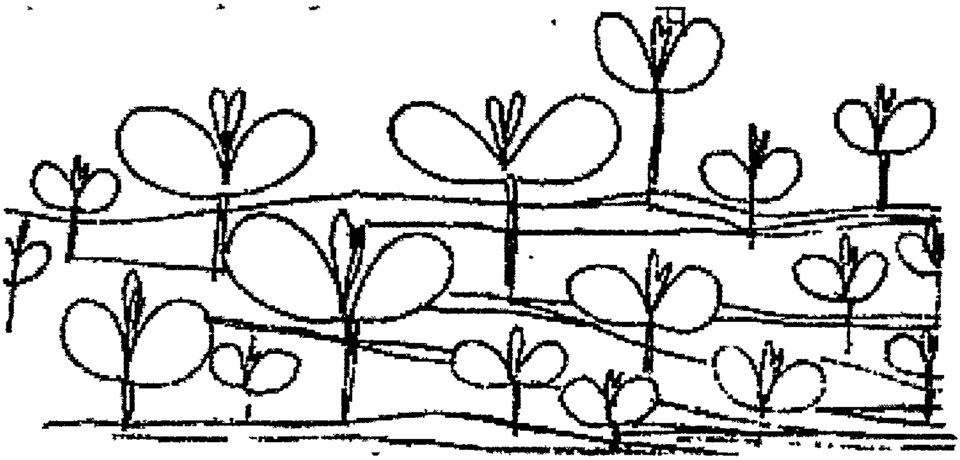
ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রা)-এর কণ্ঠে সেদিন ফজরের ওয়াক্তে সেই সুমধুর আযানের প্রথম ধ্বনি দিক হতে দিগন্তে ছড়িয়ে গেল। একে একে সবাই ছুটে এলো মৌমাছির মত আল্লাহ্র ইবাদতগাহ্ মসজিদে। ছুটে এলেন হযরত উমর। বললেন—হে আল্লাহ্র প্রিয় নবী! হে সত্যের নবী আমার! হুবহু এই কথা, এই আওয়াজ যে আজ রাতে আমি স্বপ্নের মাঝে শুনেছি। আল্লাহ্র নবী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র। শুধু তোমাদের স্বপ্ন নয়, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের ওহীও এসে গেছে।

এই আযান শাশ্বত সত্যের আহবান। সেই থেকে আজও– একই সুরে, একই শব্দে, একই আওয়াজে, প্রতিদিন পাঁচবার সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মসজিদে কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ঃ

আল্লাহু আকবার– আল্লাহু আকবার
(আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)
আশহাদু আললাইলাহা ইল্লাল্লাহ
(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই)
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্
(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল)
হাইয়া আলাস্‌সালাহ (নামাযের জন্যে সত্বর এস)
হাইয়া আলাল ফালাহ (সফলতার পথে দ্রুত এস)
আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই)।

আবার ফজরের আযানে অতিরিক্ত আর একটা কথা উচ্চারিত হয়ে থাকে, আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্ নাওম। যার অর্থ ঃ নিদ্রার চেয়ে নামায উত্তম। এ আযান কিয়ামত পর্যন্ত এমনিভাবে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকবে, দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা বিরামহীনভাবে। কারণ, আল্লাহ্র এই দুনিয়ায় এক সাথে কোনখানে দিনরাত হয় না। সময়ের তারতম্য অনুযায়ী বাংলাদেশে যখন ফজর, বিলাতে বা আমেরিকায় তখন এশা। মধ্যপ্রাচ্যে মাগরিব, আফ্রিকায় হয়তো আসর আর একখানে জোহর। এমনিভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে, প্রতি মুহূর্তে দুনিয়ার কোন না কোনখানে আযানের ধ্বনি উঠছে ঃ আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হচ্ছে শতাধিক কোটি মুসলমানের কারো না কারো কণ্ঠে। ধ্বনিত হচ্ছে আল্লাহ্র পথে, সত্যের পথে সেই শাশ্বত আহবান। যে আযানের অর্থ এক আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ঘোষণা আর ঈমানদার বিশ্বাসী মুসলমানদের ঐক্যের মন্ত্রে একতাবদ্ধ করে একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করা, অন্যায় অবিচার আর পাপ থেকে মুক্ত করা, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেহ ও মনকে পবিত্র করা।

তেইশ



মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাঁরা এলেন তাদের বলা হতো মুহাজির অর্থাৎ দেশত্যাগী এবং মদীনার বাসিন্দা, যাঁরা মুহাজিরদের ভাই হিসাবে স্থান দিয়েছিলেন তাঁদেরকে বলা হতো আনসার অর্থাৎ সাহায্যকারী। মুহাজিরগণ ছিলেন ব্যবসায়ী আর আনসারগণ ছিলেন কৃষিজীবী। নবী করীম (সা) এদের শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচি অনুযায়ী পরস্পরকে 'ভাই' সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। বললেন ঃ প্রত্যেক মুসলমান মুসলমানের ভাই। তখন তারা একে অপরকে আপন করে নিলেন। প্রত্যেকে নিজেদের জমি দিয়ে মুহাজিরদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অন্যদিকে মুহাজিরগণ তাঁদের দিলেন জ্ঞান আর শিক্ষার আলো। দুইয়ের মিলনে সৃষ্টি হলো ভবিষ্যতের নামকরা সব সিপাহসালার, দক্ষ শাসক, প্রখ্যাত রাজনীতিক, বহু জ্ঞানী-গুণী ও মনীষী। ইসলামের ইতিহাসে এরাই অমর হয়ে আছেন। দুনিয়ার মুসলমানদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। পরস্পরের প্রতি ভালবাসার এই রকম নজীর দুনিয়াতে খুব কমই দেখতে পাওয়া যাবে। মুহাজির সমস্যার সমাধান কিভাবে করতে হয় রাসূলে করীম (সা) এভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার আগে এখানে ইহুদীদের ছিল প্রবল প্রতাপ। এরা চিরকাল অর্থলোভী, সুদখোর, সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর। তারা বিশ্বাস করত, শেষ নবী তাদের বংশেই আসবে। কিন্তু তা যখন হলো না, তখন তারা নবীজীকে নিজেদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। পাছে এরা বিদ্রোহ না করে, সেই জন্যে নবীজী চুক্তিনামা সই করালেন। চুক্তি মুতাবিক স্থির হলো যে ঃ

o কেউ কারো বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

o ইহুদীরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে।

o ইহুদী ও মুসলমানদের মৈত্রী সম্পর্ক বজায় থাকবে।

o বাইরের শত্রু এসে যে কোন পক্ষকে আক্রমণ করলে অপর পক্ষ তাদের সাহায্য করবে।

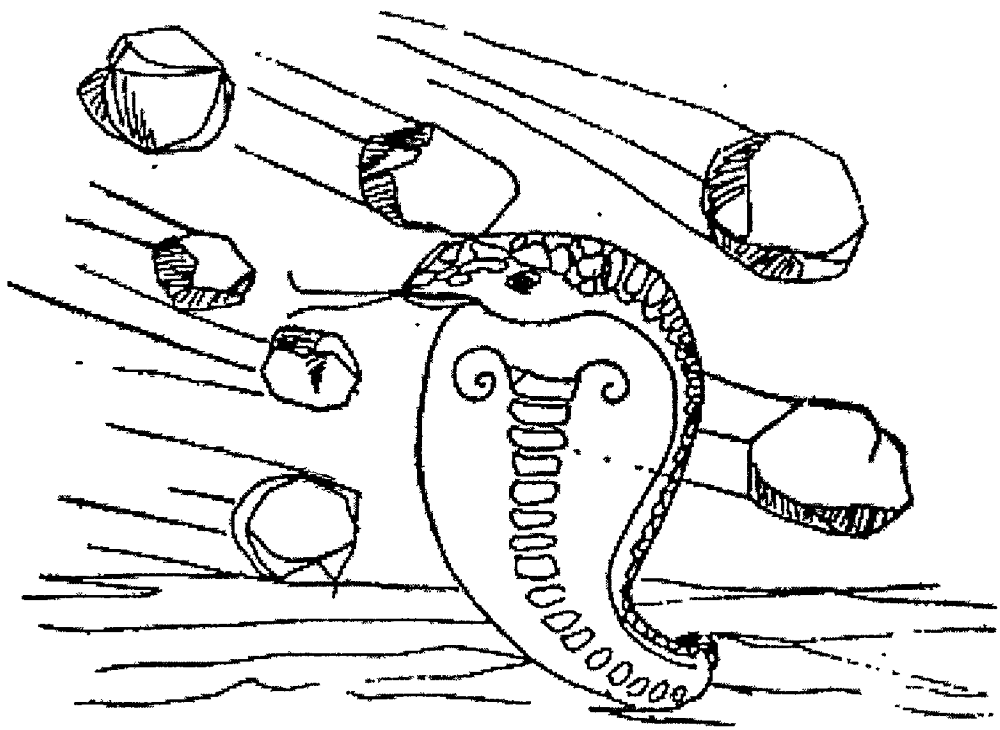
o মদীনার ওপর বাইরের শত্রু এসে হামলা করলে উভয় পক্ষ একসাথে মিলে তাকে বাধা দেবে। মদীনাকে রক্ষা করবে।

০ প্রত্যেকে আপোসে নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে ফেলবে। না পারলে হযরতের নিকটে পেশ করবে এবং তিনি যা মীমাংসা করে দেবেন, সকলকেই তা মেনে নিতে হবে।

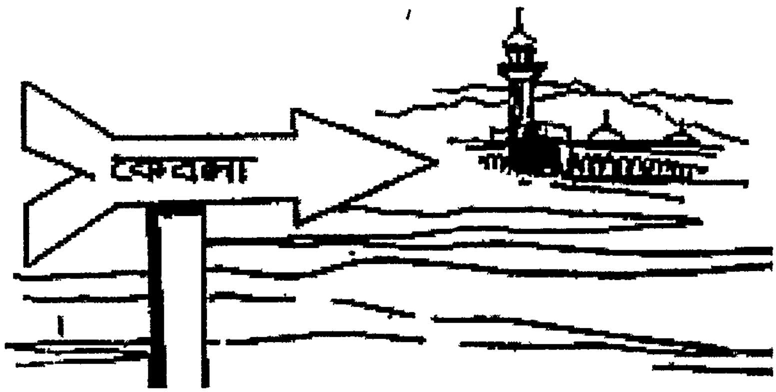
এভাবে নবী করীম (সা) মদীনায় মুহাজির, আনসার এবং ইহুদীদের নিয়ে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। সবার সম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান মনোনীত হলেন। সব ধর্মের লোকেরা এখানে পেল সমান অধিকার।

কিন্তু এই চুক্তি বেশিদিন স্থায়ী হলো না। কারণ ইহুদীরা যখন দেখলো যে, দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা আর শক্তি বেড়ে যাচ্ছে তখন তারা ভয় পেয়ে গেল। তারা গোপনে মক্কার কুরাইশদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দিল। তাদের বোঝাতে লাগলো যে, এই সময় যদি তোমরা মুসলমানদের আক্রমণ করে ধ্বংস করে না দিতে পারো– তা হলে একদিন তারা সমগ্র আরব দখল করে নেবে। আর তোমাদের অস্তিত্ব মুছে দেবে।

ইহুদীরা যদিও আল্লাহ্র কিতাবধারী, তবুও তারা মুসলমান অপেক্ষা পৌত্তলিকদের বেশি পছন্দ করত। এদের এই ঘৃণ্য চরিত্রের স্বরূপ আল্লাহ্ কুরআন পাকের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এদের থেকে সাবধান থাকার জন্যে মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন।



চব্বিশ



হিজরতের দ্বিতীয় বছরে মুসলমানদের কেব্‌লা বদল হলো। এর আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তেন। তাই বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কেবলা। বায়তুল মুকাদ্দাস উত্তর দিকে। এটা ইহুদী আর খৃষ্টান উভয় জাতির কেবলা। আল্লাহ্ পাক তাই মুসলমানদের ঐ দুই পথভ্রষ্ট জাতি থেকে পৃথক করার জন্যে তাদের কেবলাও পৃথক করে এক আয়াত নাযিল করলেন ঃ

'তুমি সম্মানিত মসজিদের দিকে অর্থাৎ কাবাঘরের দিকে তোমার মুখ ফেরাও এবং যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের মুখ সেই দিকেই ফেরাবে।'

আল্লাহ্‌র এই আদেশের ফলে মুসলমানদের লক্ষ্যস্থল ঠিক হলো খানায়ে কাবা– দুনিয়ার সর্বপ্রথম ইবাদত ঘর। কাবাঘর– যার যে দিকে পড়ে, সে সেই দিকে ফিরেই নামায আদায় করবে। তাই মদীনার মুসলমানরা দক্ষিণ দিক ফিরে নামায পড়া শুরু করলেন। কারণ মদীনার দক্ষিণে ক্বাবাঘরের অবস্থান। এই ব্যবস্থায় ইহুদীরা ভীষণ চটে গেল। তারা এবার নবী করীম (সা) এবং ইসলামের নিন্দা করে বেড়াতে লাগলো।

০ ০ ০

ওদিকে মদীনায় মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কাছে কুরাইশরা চিঠি পাঠালো, মুসলমানদের ছলে-বলে-কৌশলে ধ্বংস করার জন্যে। মুনাফিক কাকে বলে জানো ? মুনাফিক তাকেই বলে, যে মুখে বন্ধুর ভাণ করে আর মনে শক্রতা পোষণ করে। কথায় একরকম আর কাজে আর এক রকম। এরা প্রকাশ্য দুশমনের চেয়েও খারাপ। এদের ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে কুরআন পাকে আল্লাহ্‌র আয়াত আছে।

আবদুল্লাহ মুখে ইসলাম গ্রহণ করে নামে মুসলমান হয়ে মুসলমানদের সাথে মিশতো। তাদের ভেতরের সব কথা জেনে নিত আর গোপনে তা শক্রদের কাছে পাচার করে দিত। আবদুল্লাহ যখন মুসলমানের শক্তি দেখে একা কিছু করতে পারলো না, তখন কুরাইশদের ছোট ছোট সৈন্যদের পাঠিয়ে মদীনার সীমানা থেকে মুসলমানদের উট, দুম্বা, ভেড়া, বকরী ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যেতে

লাগলো। জমিনের ফসল কেটে নিয়ে যেতে লাগলো। আর সেই সাথে অতর্কিতে মদীনায় হামলা চালাবার প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

নবী করীম (সা) ওদের মতলব বুঝতে পারলেন। তিনিও তখন আত্মরক্ষার জন্যে মুসলমানদের সামরিক কায়দায় তৈরি করলেন এবং নিজে রাত জেগে তাদের সাথে পাহারা দিতে লাগলেন। কারণ কাফিরদের নিয়ম ছিল নিয়ম-মাফিক যুদ্ধ না করে অতর্কিতে হামলা করা।

কুরাইশরা ব্যবসায়ী, একথা আগেই বলেছি। তাদের ব্যবসায়ের প্রধান বাজার ছিল সিরিয়া। সিরিয়া আর মক্কার মাঝখানে মদীনার অবস্থান। নবীজী ঠিক করলেন, ওদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই পথ বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ– সিরিয়ায় ব্যবসা করে যে অর্থ তারা আয় করছে, সেই অর্থ দিয়েই তারা মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই প্রথমেই মদীনার চারপাশে যে সব গোত্রের লোক বাস করত, তাদের সাথে একটা সন্ধি করে ফেললেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাস। নবীজী একদিন খবর পেলেন যে, আবূ সুফিয়ান সিরিয়া থেকে যুদ্ধের বহু সাজ-সরঞ্জাম কিনে নিয়ে মক্কায় ফিরছে। আর অন্যদিকে আবূ জেহেল এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কি বিপদ! তিনি তখনই সবাইকে ডেকে পাঠালেন। সবাই ছুটে এলো। সবাই শুন্‌লো। সবাই চিন্তায় পড়লো। এখন উপায় ?

মুহাজিরদের পক্ষে হযরত আবূ বকর (রা) এবং আনসারদের পক্ষে মিকদাদ ও সায়াদ ইবনে ওবায়দা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা ইসলামের ইজ্জত রক্ষার জন্যে আমাদের জানমাল সব কোরবান করতে প্রস্তুত।

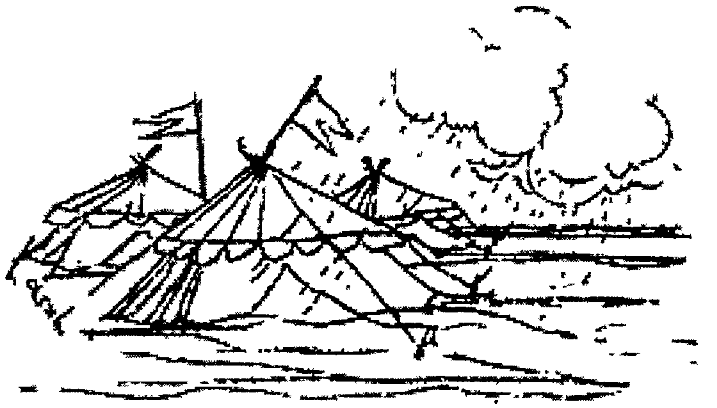
তখন রাসূলুল্লাহ্‌র আদেশে তিনশো জান-নেসার অর্থাৎ জীবন দিতে প্রস্তুত এই রকম বাছাই করা মুসলমানদের নিয়ে একটি পদাতিক বাহিনী গঠন করা হলো। তারপর নবীজীর নেতৃত্বে মদীনা থেকে সেই বাহিনী রওনা হলো।

তাঁরা এসে থামলেন মদীনা থেকে ৮০ মাইল দূরে 'বদর' নামে একটা জায়গায় এসে। সেদিন ১৭ রমযান। এর আগেই কিন্তু আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে জিহাদের হুকুম নাযিল হয়েছিল এই বলে ঃ

'আল্লাহ্‌র পথে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো– যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসে।'

এই জিহাদ শুধু আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। সুতরাং বুঝতেই পারছো, যে যুদ্ধ প্রভুত্ব, রাজ্য বিস্তার, ধন-সম্পদ লাভ বা শক্তি ও বাহাদুরি দেখাবার জন্যে করা হয়, সে যুদ্ধ শয়তানের যুদ্ধ। সেটা জিহাদ নয়। একমাত্র আল্লাহ্‌র কালামকে জয়যুক্ত করা এবং বিধর্মীর ষড়যন্ত্র ছিন্ন করার জন্যে, কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যেই জিহাদ। নিজেকে, নিজের ধর্মকে রক্ষার জন্যে জিহাদ। অন্যকে আক্রমণ করার জন্যে নয়। জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধে যাঁরা নিহত হন তাদেরকেই বলা হয় শহীদ আর যারা জয়ী হয়ে ফিরে আসেন তাঁদের বলা হয় গাজী।

পঁচিশ



যা হোক–নবীজী বদর প্রান্তরে এসে তাঁবু গাড়লেন। জায়গাটা ছিল বালুকাময়। পানি নেই। এখন উপায় ? অদূরে কুরাইশদের শিবির। আল্লাহ্‌র কুদরত! এক সময় হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। শুরু হলো প্রবল ধারায় বৃষ্টিপাত। মুসলমানরা তাড়াতাড়ি সেই পানি মশকে ভরে নিল। পান করার জন্যে, ওযুর জন্যে। মুসলমানদের শিবিরের ধুলা-বালি বৃষ্টির পানিতে বসে গেল। আর ওদিকে কুরাইশদের শিবির কর্দমাক্ত হয়ে তাদের চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি করল। চলতে গেলে পা পিছলায়।

পরদিন ভোরে শত্রুরা যুদ্ধের জন্যে অগ্রসর হলো। অসংখ্য সুসজ্জিত সেনা। আর মুসলমানদের সংখ্যা সামান্য। রাসূলুল্লাহ্ সিজ্‌দায় গেলেন। আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে এই বলে মুনাজাত করলেন ঃ

–"আয় আল্লাহ্ পাক ! আজ তোমার ওয়াদা পূরণ করো। হে আমার জীবন-মৃত্যুর মালিক ! আজ যদি মুসলমানদের এই বাহিনী পরাজিত হয়, যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় তোমার নাম উচ্চারণ করার মত আর কেউই থাকবে না।"

মুনাজাত শেষ করে নবী করীম (সা) হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো ঃ দুশ্‌মন পরাজিত হবে এবং পালিয়ে যাবে।

তখনকার দিনে যুদ্ধের রীতি ছিল অন্য রকম। এক দলের বাছাই করা বীর আর এক দলের বাছাই করা বীরকে সম্মুখ-যুদ্ধে ডাক দিত। ঢাল-তলোয়ার আর তীর-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ হতো। আজকের মত কামান, বন্দুক, রকেট এসব কিছুই ছিল না। অন্ধকারে আচমকা কেউ বোমা ফেলে দিয়েও পালাতো না। যুদ্ধে একজন নিহত হলে আবার একজন অগ্রসর হতো শত্রুর সাথে লড়াই করতে। যুদ্ধ শুরুর আগে নবী করীম (সা) জ্বালাময়ী এক বক্তৃতা দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আবূ বকর ! সুসংবাদ নাও। তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য এসেছে। ঐ দ্যাখো, জিবরাইল ঘোড়ার লাগাম ধরে বালিয়াড়ির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরাও এগিয়ে যাও ঐ বেহেশ্‌তের দিকে, আসমান ও জমিন জুড়ে যার বিস্তৃতি। ঐ বেহেশ্‌ত

তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে। আল্লাহ্কে যারা ভয় করে, আল্লাহ্র রাস্তায় যারা জীবন দিতে তৈরি, তাদের জন্যে ঐ বেহেশ্ত। যাও, এগিয়ে যাও।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে তিনজন মহাবীর—ওতবা, শায়বা আর ওলিদ হুংকার দিয়ে এগিয়ে এলো। সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান জানালো মুসলমানদের। আজ তারা মুসলমানদের নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দেবে। সত্যের আলো নিভিয়ে দেবে। দেবতা হোবল আর ওজ্জার দুশমনদের চিরতরে খতম করে দেবেই, এই তাদের অভিপ্রায়। সংখ্যায় তারা এক হাজার আর মুসলমান মাত্র তিন শো তেরোজন। এক ফুৎকারে উড়ে যাবে। আনন্দে তারা চিৎকার করে। লাফায়। আর মুসলমানদের হাঁক ছেড়ে ডাক দেয় ঃ কে আছ বীর বাহাদুর! এগিয়ে এসো। দেখি তোমাদের আল্লাহ্র কত ক্ষমতা। কেমন করে তোমাদের আজ রক্ষা করে!

নূরনবী স্বয়ং মুসলমানদের সেনাপতি। সত্যের সিপাহ্সালার। তিনি কুরাইশদের হুংকার স্তব্ধ করে দেবার জন্যে বীরকেশরী হযরত হামজা, ওবায়দা আর শেরে খোদা হযরত আলীকে এগিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। সিংহবিক্রমে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। হযরত হামজা ওত্বাকে এবং হযরত আলী ওলিদ আর শায়বাকে খতম করে তাদের হুংকার আর মিথ্যা অহংকার চিরতরে স্তব্ধ করে দিলেন। ওবায়দা আহত হলেন। তাঁকে নিয়ে তাঁরা ফিরলেন তাঁবুতে। ইতিমধ্যে তাদের সেনানায়ক কুখ্যাত আবূ জেহেল, মুয়াজ আর মায়াজ নামে ছোট্ট দুটো ছেলের হাতে নিহত হলো। কুরাইশরা হায় হায় করে উঠলো।

'মারো অরি পারো যে কৌশলে'। এই বলে একসাথে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো এবার মুসলমানদের ওপর। দুর্বলের সাহায্যকারী আল্লাহ্। সত্যের সাথী আল্লাহ্। আল্লাহ্র দীনকে, আল্লাহ্র কিতাবকে, আল্লাহ্র আদেশকে, আল্লাহ্র রাজত্বকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই তো মুসলমানদের এই লড়াই। দেশ ছেড়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে, ধন-সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়া, নিঃস্ব পথের ভিখারী সাজা এ সবই তো তাঁরই জন্যে। আল্লাহ্র প্রতি এত নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যাদের, আল্লাহ্ কি তাদের সাহায্য না করে পারেন ? এবার নেমে এলো আল্লাহ্র সাহায্য। শুরু হলো আকাশের গর্জন। ঘন কালো মেঘে আকাশ গেল ছেয়ে। ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝল্কানি। ঝড় উঠলো। ভীষণ ঝড়। কুরাইশদের ঠেলে ফেলে দিতে লাগলো। সেই সাথে প্রবল বৃষ্টির ধারা আর প্রচণ্ড শীত। তাদের হাজার সেপাই কুপোকাৎ। পথভ্রষ্ট হলো তারা। যে দিকে পারলো ভয়ে পালাতে শুরু করলো। আল্লাহ্র কুদরত ! মুসলমানরা এবার অতি সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করলো।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে শহীদী দরজা লাভ করেন মাত্র ১৪ জন। আর কুরাইশ নেতাদের ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। মুসলমানদের কাউকে তারা বন্দী করতে পারেনি। কারণ মুসলমানরা জিহাদে যায় হয় যুদ্ধে জিতে গাজী হওয়ার জন্যে, নয়তো আল্লাহ্র রাহে জীবন দিয়ে শহীদ হওয়ার জন্যে। হেরে গিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে নয়। এই বদরের যুদ্ধই ইসলামের প্রথম জিহাদ। তাই এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

সাহস, ঈমান, ধৈর্য, শৃংখলা আর মনোবলের সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্যের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, সত্যের জন্যে লড়াই করলে যে কোন অত্যাচারীকে, যে কোন পশুশক্তিকে, সে যত শক্তিশালীই হোক, তাকে পরাজিত করা সম্ভব। 'ঈমানদারের কাছে শত্রুদের সংখ্যার কোন মূল্য নেই,' বদর যুদ্ধের এই শিক্ষা মুসলমানদের জন্যে চিরদিন অম্লান হয়ে আছে, অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে। বদর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে, মুসলমানরা এবার একটা শক্তিশালী জাতি হিসাবে দুনিয়ায় প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তাদের মান-মর্যাদা বেড়ে গেল। আর দুনিয়ার বুকে ইসলাম একটা বলিষ্ঠ ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পেল।

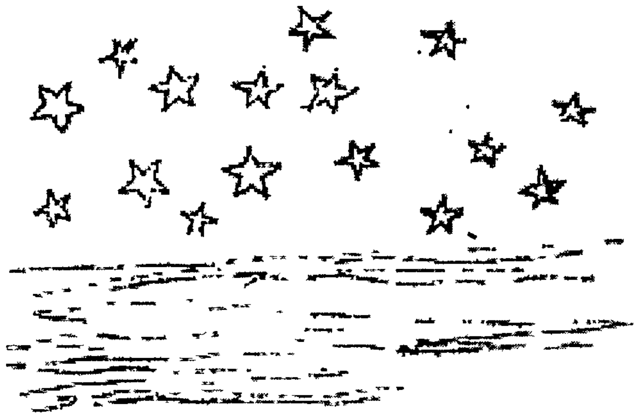
মুসলমানদের প্রথম এই জিহাদে আল্লাহ্ পাক যে সাহায্য করেছিলেন সে কথা কুরআন পাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে–

'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন–অথচ তোমরা ছিলে শক্তিহীন, দুর্বল।'

যে কোন যুদ্ধে যারা বিজেতা, তারা বিজিতদের সাথে আজকের এই সভ্যযুগেও অমানুষিক ব্যবহার করে থাকে। শহরে, নগরে লুঠতরাজ, খুন-খারাবি–যা খুশি তাই শুরু করার অধিকার তাদের। আর যুদ্ধবন্দীদের সাথে তো কথাই নেই। জীবনমরণ তাদের দয়ার ওপর। কিন্তু চৌদ্দশো বছর আগে– সেই অন্ধকার যুগেও, যে যুগের মানুষ রক্তপণ ছাড়া আর কিছু জানতো না-সেই যুগে আমাদের নবী, মানুষের নবী, দয়ার নবী কি করলেন ? যে সব কাফির আত্মীয়-স্বজন বন্দী হয়েছিল, তারা ইসলামের ঘোর দুশমন হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিপণের বদলে তাদের ছেড়ে দিলেন। যাদের মুক্তিপণের টাকা দেবার ক্ষমতা ছিল না– তাদের বলা হলো ঃ তোমরা প্রত্যেকে মদীনার ১০টি করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে। তারপর মুক্তি পাবে। অথচ সে সময়কার নিয়মই ছিল, যুদ্ধে যারা বন্দী হবে তাদের সবাইকে হত্যা করতে হবে।

শুধু কি তাই ? যুদ্ধবন্দীদের সাথে তাঁর ব্যবহারও আজকের সভ্যতাগর্বী, মানবতার নামে যারা সারা দুনিয়া তোলপাড় করে বেড়ায়– তাদেরও অনুকরণীয়। বন্দীদের তিনি ধরে নিয়ে গেলেন কিভাবে ? নিয়ে গেলেন ঠিক মেহমানের মত উটের পিঠে চড়িয়ে। আর নিজে গেলেন তাদের সাথে পবিত্র পায়ে হেঁটে। খাবার তালিকাতেও মুসলমানদের জন্যে রইলো শুধু শুক্‌নো খেজুর, আর বন্দীদের জন্যে রইলো গোশ্‌ত-রুটি, সেই সাথে আরো ভালো ভালো খাবার। বন্দী হলেও তারা তো তাঁদের মেহমান। পরাজিত যে, নিঃসহায় যে, তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া তো কাপুরুষের কাজ। তাই বন্দীদের কোন কষ্ট দেখলে দয়ার নবী সময় সময় কেঁদে ফেলতেন।

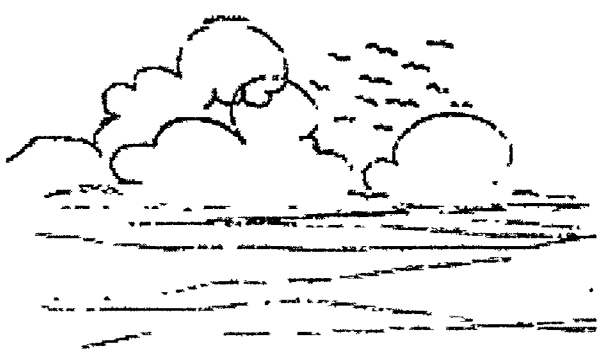
ছাব্বিশ



হিজরী দ্বিতীয় সাল। যিল্‌হজ্জ মাসে নবী-দুলালী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা)-এর সাথে শেরে খোদা হযরত আলী (রা)-এর শাদী মুবারক সম্পন্ন হলো। এই বিয়ের দেনমোহর কি ছিল জানো? আমাদের হিসাবে মাত্র এক টাকা পঁচিশ পয়সা। আর নবীজী তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় কন্যাকে উপহার হিসাবে দিলেন– দড়ি দিয়ে বোনা একখানা চারপায়া, খেজুর পাতা ভরা একটা চামড়ার গদী, একটা বকরী, পানি রাখার জন্যে দুটো মাটির ঘড়া আর একটা মশক। দীন-দুনিয়ার বাদ্‌শাহের তরফ থেকে কন্যা-জামাতার উপহার ছিল এই। আজকাল এটা একটা কৌতুক মনে হবে, তাই না?

আমরা তাঁরই উম্মত। আমরা এখন কি করি? হাজার হাজার টাকা বিয়ে-শাদীতে আজেবাজে খরচ তো করিই, তার ওপর কন্যার পিতাকে সর্বস্বান্ত করে গাড়ি-বাড়ি, গয়না, খাট-পালং, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ– আরো কত কি জোর করে আদায় করি। অথচ এগুলো নবীজীর আদর্শের, ইসলামের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নাখোশ হন।

এই বছরেই মুসলমানদের ওপর রোযা রাখা ফরজ হয় আর সেই সাথে জামাআতে ঈদুল-ফিতরের নামায এবং ফিতরার সদ্‌কা দেবারও হুকুম হয়।



সাতাশ



ওদিকে বদরের যুদ্ধে হেরে গিয়ে কুরাইশদের দুঃখের আর সীমা নেই। জানমাল দুই-ই গেছে। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে। আহা! কি আফ্‌সোস্‌! সবাই ছিঃ ছিঃ করছে। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তো দিনরাত স্বামীকে গালাগাল দিচ্ছে। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তার পৌরুষে ঘা দিয়ে সব সময় কথা বল্‌ছে। কারণ– সবচেয়ে বেশি আত্মীয়-স্বজন তারই মারা গেছে।

কুরাইশ সর্দাররা শেষে একসাথে মিলিত হলো। কুরাইশদের জাগাতে হবে আবার। দু'জন নাম-করা কবিকে ডাক্‌লো। তারপর তাদের পাঠালো মক্কার বিভিন্ন গোত্রকে আগুন-ঝরা কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে। তাতে কাজ হলো। ধীরে ধীরে মক্কাবাসীর মনে আবার আগুন জ্বলে উঠলো। প্রতিশোধ চাই।

তা'রা তৈরি হলো-বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে। প্রস্তুত হলো তিন হাজার কুরাইশ সেনার এক বিরাট বাহিনী। আবূ সুফিয়ান হলো সেনাপতি। তারপর একদিন অগ্রসর হলো মদীনা আক্রমণ করতে। সঙ্গে চল্‌লো মেয়েরা। তারা গান গেয়ে সৈন্যদের উৎসাহ দেবে, প্রেরণা যোগাবে।

মদীনায় হযরতের কাছে খবর পৌঁছে গেল যে, কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের জন্যে আসছে। ইতিমধ্যে ওহুদ পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছেও গেছে। খবর আসার সাথে সাথেই নবীজী মদীনার সব মুসলমানকে ডাক দিলেন। সবাই ছুটে এলো। খবর তারাও পেয়েছে। সবাই চিন্তিত। সবাই উত্তেজিত। এক্ষুণি বাধা দিতে হবে!

নবীজী বললেন, এই যুদ্ধে মুসলমানদের এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ মুসলমানরা সংখ্যায় কম। মক্কাবাসী প্রথমে আক্রমণ করুক। মদীনাবাসী শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে।

যারা বয়স্ক, অভিজ্ঞ, চিন্তাশীল, তাঁরা নবীজীর মতে সায় দিলেন। কিন্তু যুবকদের রক্ত গরম। তারা এ প্রস্তাব মেনে নিল না। তারা জিদ ধরলো- 'না, আমরা এগিয়ে যাবো। মদীনা আক্রমণের সুযোগ মক্কাবাসীকে কিছুতেই দেওয়া হবে না।'

যুবকরা দলেও ভারী। রক্ত গরম। যুক্তির ধার ধারে না সহজে। নবীজী বুঝালেন। শেষে বাধ্য হয়ে তাদের কথাই মেনে নিলেন। প্রস্তুত মুসলিম বাহিনী। সংখ্যায় তারা এক হাজার। এদের মধ্যে

মুনাফিকদের দলপতি আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই তার তিনশো সঙ্গী নিয়ে সরে পড়লো। কিছুতেই সে যুদ্ধে যেতে রাজী হলো না। ফলে তিনশো লোক কমে গেল। মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র সাতশোতে। এর মধ্যে একশো জনের ছিল বর্ম আর মাত্র দু'টো অশ্ব।

রাসূলুল্লাহ (সা) জুমআর নামায পড়ে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। ওহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে ব্যূহ রচনা করলেন। তীরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জোবায়ের-এর হাতে। পাহাড়ের ওপরের ঘাঁটিপথ রক্ষার ভার নিলেন নিজে এবং মোছয়াব ইব্‌নে উমায়ের (রা)-এর হাতে দিলেন মুসলমান বাহিনীর পতাকা। তারপর– প্রত্যেককে তাদের ওপর দেওয়া দায়িত্ব কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, খবরদার ! আমার বিনা হুকুমে কেউ নিজের জায়গা থেকে এক তিলও নড়বে না।

যুদ্ধের শুরুতেই কুরাইশদের নিশান-বর্দার মহাবীর তাল্‌হা মুসলমানদের লক্ষ করে ঠাট্টার সুরে বলল ঃ

–কে আছো বাহাদুর মুসলমান, যে আমাকে তোমাদের জাহান্নামে পাঠাতে পারে ? এসো, এগিয়ে এসো। আর যদি না পারো, তবে এসো, আমি তোমাদের জান্নাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।'

এই কথা শুনে আল্লাহ্‌র বাঘ, শেরে খোদা হযরত আলী (রা) 'আল্লাহু আকবর' বলে লাফ দিয়ে পড়লেন। বললেন, 'এই যে আমি আছি।'

তারপর তলোয়ারের এক আঘাতে তার বাহাদুরি খতম করে দিলেন। সাথে সাথে তার ভাই উসমান ছুটে এলো। হযরত হামজা (রা)-এর হাতে তারও জীবন প্রদীপ নিভে গেল। কুরাইশরা দেখল বিপদ। এভাবে তো পারবে না। তারা সব এবার একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসলমানদের ওপর। উঃ সে কী ভীষণ যুদ্ধ ! একদিকে অস্ত্রবলে বলীয়ান তিন হাজার সৈন্য আর অন্যদিকে মাত্র সাত শত। তা'ও নিরস্ত্র প্রায়।

কিন্তু কম হলে কি হবে ? মুসলমানরা যে ঈমানের বলে বলীয়ান। তা'রা যে শহীদী জামাতে শামিল হওয়ার জন্যে উন্মাদ। আল্লাহ্‌র রাহে জীবন উৎসর্গকৃত এক-একটা সিপাহী। মৃত্যু তাদের পায়ের ভৃত্য। মাথায় জড়ানো কাফনের কাপড়। হাতে দু'ধারী তলোয়ার। মুখে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। সংখ্যা দেখে কি তাঁরা ভয় পায় ?

মুসলমানদের পক্ষে হযরত হামজা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবূ দোজানা এবং আরো অনেক বীরের তরবারির মুখে কচুগাছের মত কাফিরদের কল্লা উড়ে যেতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে কুরাইশ সৈন্যরা তখন যে যেদিকে পারলো, জান নিয়ে পালাতে শুরু করলো। আবূ সুফিয়ান হাজার চেষ্টা করেও কুরাইশ সৈন্যদের আর একত্র করতে পারলো না।

এদিকে কুরাইশ সৈন্যদের নিশ্চিত পরাজয় দেখে আর তাদের ভেড়ার পালের মত পালাতে দেখে মুসলমান সৈন্যরা খুশিতে মেতে উঠলো। তারা যুদ্ধের কথা ভুলে শত্রুদের ফেলে যাওয়া

মাল-মাত্তা লুট করতে লেগে গেল। আর অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাদের ওপর পাহাড়ের ঘাঁটি পাহারা দেবার ভার দিয়ে এসেছিলেন এবং নিষেধ করে এসেছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই তোমরা ঘাঁটি ছেড়ে যেও না; তারা যখন দেখল– সবাই লুটতরাজ করছে আর তারা ফাঁকে পড়ে যাচ্ছে, তখন লোভ সামলাতে পারল না। তারা তীর-ধনুক ফেলে, নবীজীর নিষেধ ভুলে, পাহাড় থেকে নিচে নেমে এল। সেখানে রইল মাত্র বারো জন। দলপতি আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের আর এগারো জন তীরন্দাজ।

শত্রুপক্ষের মহাবীর খালিদ সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে ছিলেন। তিনি এই সুযোগে হঠাৎ ঘাঁটির ওপর আক্রমণ করলেন। মাত্র ক'জন ঘাঁটিরক্ষক। প্রাণপণ যুদ্ধ করেও তাঁরা শহীদ হলেন। তারপর খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অপ্রস্তুত মুসলিম বাহিনীর ওপর। হায়! হায়! এ কী হলো ? সবাই থ'। নেমে এলো মহাবিপর্যয়। জয়ের আনন্দ পরাজয়ের গ্লানিতে পরিণত হওয়ার উপক্রম। আল্লাহ্র নবীর নিষেধ না মানার ফল হাতে হাতে ফলল।

ইসলামের পতাকাবাহী মোছয়াব বিন্ উমায়ের (রা) শহীদ হলেন। আর এই সাথে কাফিররা গুজব ছড়িয়ে দিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শহীদ হয়েছেন। এই গুজব অনেকেই বিশ্বাস করল। মুসলমানদের মনোবল ভেঙে গেল। গুজবের কারণ রাসূলুল্লাহ্র চেহারার সাথে মোছ্য়াবের চেহারার মিল ছিল। তাই তারাও ভেবেছিল যে, সত্যি সত্যি মুহাম্মদ (সা) শাহাদত বরণ করেছেন।

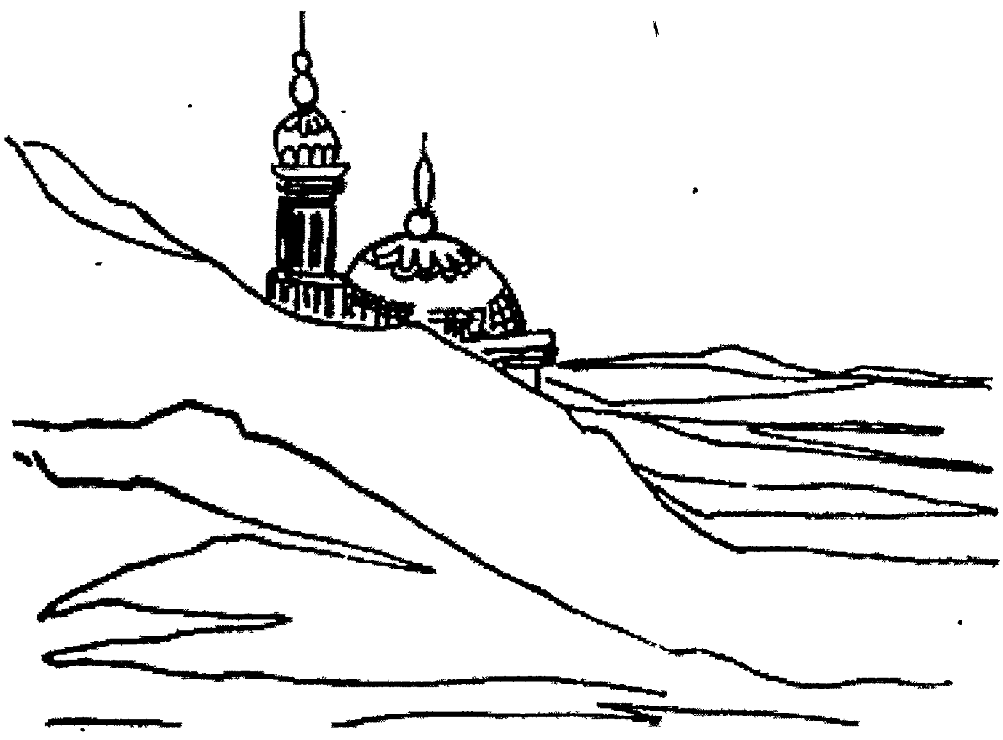
ওদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছেন হযরত আলী (রা), হযরত আবূ বকর (রা) এবং আরো ন'জন সাহাবী। যাতে তাঁর পবিত্র দেহে কেউ আঘাত হানতে না পারে। বীরবিক্রমে তাঁরা দুশমনের আঘাত ঠেকিয়ে চলেছেন। হঠাৎ কাব ইবনে মালিক (রা) নামে একজন সাহাবী নবীজীকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন ঃ ঐ যে নবীজী। নবীজী আছেন– নবীজী আছেন।

এদিকে কাফিররা মরিয়া হয়ে বৃষ্টিধারার মত তীর ছুঁড়তে লাগলো। পাথর ছুঁড়তে লাগলো। সহসা একজনের তরবারির আঘাত নবীজীর মাথার লোহার শিরস্ত্রাণে এসে লাগলো। লোহার কড়া ভেঙে নবীজীর মুখে লাগলো, তাঁর চেহারা মুবারক জখম হয়ে গেল। তাঁর পবিত্র দুটি দাঁত শহীদ হলো। আর সেই জখমী ঘা নিয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীন আল্লাহ্র কাছে মুসলমানদের ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইতে লাগলেন এই বলে, আয় আল্লাহ্! আমার জাতিকে তুমি মাফ করে দাও, কারণ তারা অবুঝ, তারা জানে না– তারা কি করছে।

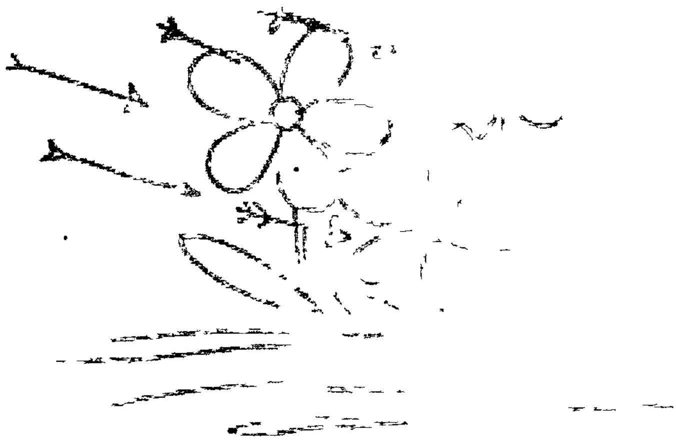
আল্লাহ্ পাকের ক্ষমা নেমে এলো। নেমে এলো আল্লাহ্র সাহায্য। মুসলমানরা আবার হারানো জোশ, শক্তি-সাহস ফিরে পেল। একদল জীবন উৎসর্গকারী সাহাবা নবীজীকে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে চলে গেলেন। অন্যেরা পাথর বর্ষণ করে দুশমনদের ঠেকিয়ে রাখলেন। ফলে কাফিররা আর মুসলমানদের পিছু নিতে পারলো না। ফলে ওহুদের যুদ্ধে কোন পক্ষেরই আর জয়-পরাজয় হলো না।

এই যুদ্ধে আল্লাহ পাক কি শিক্ষা দিলেন জানো ? যুদ্ধের ময়দানে যারা নেতার আদেশ না মানে– যারা নবীর নির্দেশ ভুলে যায়, যারা পার্থিব ধন-সম্পদের লোভে আপন কর্তব্য ভুলে যায়, যারা বিপদে ধৈর্য না ধরে, একতাবদ্ধ না থাকে, তাদের পরিণতি এমনি হয়। ভবিষ্যতের জন্যে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এটা হচ্ছে একটা সাবধান বাণী।

এই যুদ্ধে বীরবর হযরত হামজা (রা) ও মোছয়াব বিন উমায়ের (রা)সহ মোট সত্তর জন মুসলমান শহীদ হন এবং প্রায় সকলেই জখম হন। এই যুদ্ধে পৌত্তলিক কুরাইশরা, ইসলামের জানী-দুশমনরা, শহীদদের লাশের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল তা' ভাবলে আজও শরীর শিউরে ওঠে। আর এই ব্যবহার করেছিল তাদের নারীরা। যেখানে হযরত আয়েশা (রা), উম্মে সলিম (রা), উম্মে আম্মারা (রা)-এর মত মহীয়সী মুসলমান নারীগণ যুদ্ধে আহতদের সেবা করেছেন, পানি পান করিয়েছেন– সেখানে কাফির রমণীরা শহীদদের লাশ থেকে হাত-পা কেটে নিয়ে গলার মালা বানিয়েছে। আনন্দে নেচেছে। আর আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা কি করেছিল জানো ? হযরত হামজা (রা)-এর লাশ ফেড়ে কল্‌জে বের করে রাক্ষুসীর মত চিবিয়ে খেয়েছিল। উঃ! কি নৃশংসতা! কি নিষ্ঠুরতা ! কি প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী! ভাবতে পারো ? এগুলো সবই নাকি তখনকার যুদ্ধের নিয়ম ছিল। দয়ার নবী যুদ্ধের এই সব নিষ্ঠুর নিয়ম-কানুন উঠিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষের সাথে মানুষের মত ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।



আটাশ



পৌত্তলিক কুরাইশরা যুদ্ধে সুবিধা হচ্ছে না দেখে এবার অন্য পথ ধরলো। সে পথ মুনাফিকীর পথ। সামনে বন্ধু, পেছনে দুশমন। অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতার পথ। আগেই বলেছি– মক্কায় বিভিন্ন গোত্র ছিল। আর প্রত্যেক গোত্রের ছিল এক-একজন নেতা। 'কেলাব' গোত্রের নেতা আবুল বারায়া। একদিন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দেখা করে বলল ঃ আমাদের গোত্রের লোকেরা ইসলামের শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে গেছে। তারা সবাই এখন মুসলমান হতে চায়। আপনি যদি মেহেরবানী করে কয়েকজন ভালো লোককে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্যে আমার সাথে পাঠান– তা হলে আমরা খুবই খুশি হবো।

নবীজী তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে বলল ঃ আমি নিজে তাঁদের জীবন-রক্ষার দায়িত্ব নিলাম। আপনি কিছু ভাববেন না।

মুসলমানরা সরল। আল্লাহ্র নামে পাগল। সত্তর জন আন্‌সার স্বেচ্ছায় এই মহান কাজে যেতে প্রস্তুত হলেন। তাঁরা নবীজীর মত চাইলেন। নবীজী চিন্তা করছিলেন। কিন্তু তাঁদের আগ্রহ দেখে মত দিলেন। তারপর কি হলো জানো?

তাঁরা চলেছেন আবুল বারায়ার সাথে। বেশ কিছুদূর গিয়ে 'বীর মাউনা' নামে একটা নির্জন জায়গায় এসে যেই তাঁরা পৌঁছেছেন, অমনি আমের ইব্‌নে মালহান নামে একজন লোক কোথা থেকে তার বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কি জঘন্য ষড়যন্ত্র! তাঁরা ছিলেন নিরস্ত্র, অসহায়। তাই প্রায় সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'জন সাহাবী কোনমতে পালিয়ে জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

এ ছাড়া আরো একবার দশজন সাহাবীকে অন্য দুই গোত্রের লোক এসে ইসলাম প্রচারের নামে ধোঁকা দিয়ে নিয়ে যায় এবং তাঁদেরকে পথের মাঝে নির্জন জায়গায় এনে হত্যা করে পালিয়ে যায়। নবী করীম (সা) এই সব ঘটনায়, কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতায় মনে অত্যন্ত দুঃখ পান।

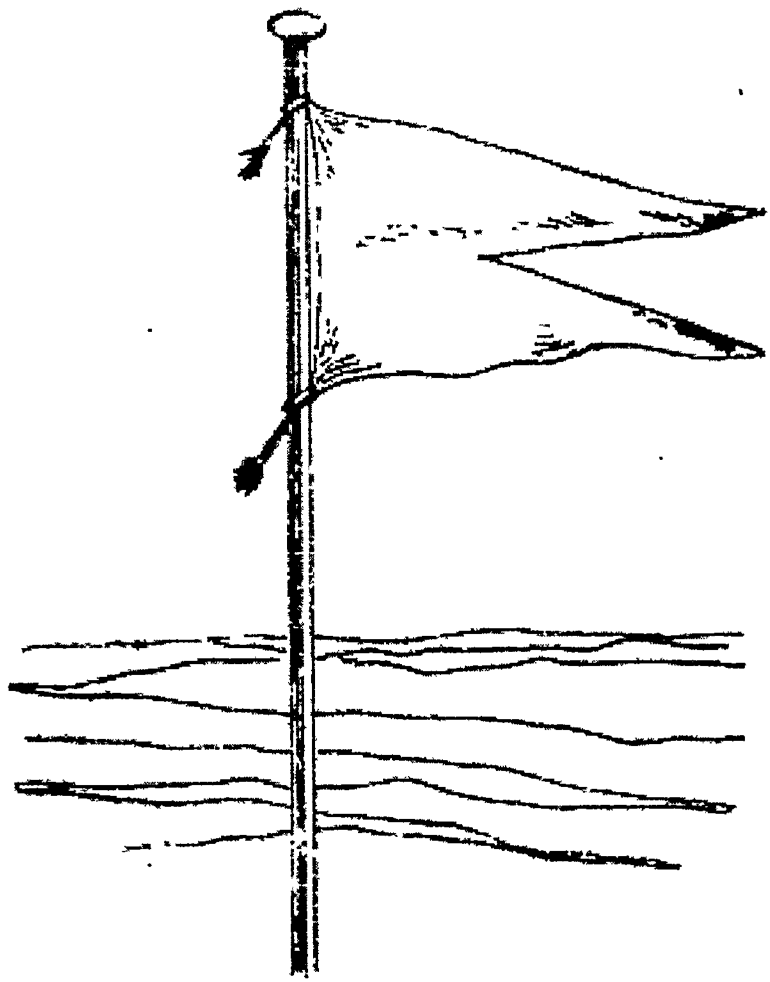
এর ওপর আবার মদীনার ইহুদীদের শত্রুতা। শত্রুতার কারণ, তারাই ছিল মদীনার শিক্ষিত ধনী ও জমিদার শ্রেণীর লোক। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল তাদের হাতে। তারাই ছিল সভ্য এবং সমাজের নেতা। মদীনার অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল গরীব। তারা তাদের নির্দেশে চলতো– তাদের জমিতে এরা খেটে খেতো। অভাবের সময় তাদের কাছে সুদে টাকা ধার নিত। টাকা পরিশোধ করতে না পারলে তাদের জমিজমা, ঘরবাড়ি, এমন কি ছেলে-মেয়ে, বউ পর্যন্ত বন্ধক দিতে হতো। শুধু কি তাই ? অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারে ইহুদীরা সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাদের কিতাব তওরাতের শিক্ষা ভুলে এমন কোন কাজ নেই, যা তারা করতো না। একই অপরাধে ইহুদীরা পেতো মুক্তি আর অন্যেরা পেতো শাস্তি। গরীবদের ওপর ইহুদীদের প্রভাব এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, মদীনার অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ ছেলে হলে তাকে ইহুদী বানাবে বলে মানত করতো। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবে– নবীজীর শিক্ষায়, সেই সাধারণ অজ্ঞ মানুষ যখন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল, যখন বুঝলো ?

০ এক আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রভু নেই।
০ মানুষে মানুষে নেই কোন প্রভেদ।
০ আইনের চোখে, আল্লাহ্র কাছে বাদশাহ-ফকির সব এক সমান।
০ আল্লাহ্র দানে সকলের সমান অধিকার।
০ একজন পেট পুরে খাবে, আর দশজন না খেয়ে থাকবে– আল্লাহ্র বিধান তা নয়।

তখন ইহুদীদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। গরীব মুসলমানরা ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে লাগলো। একে অন্যকে সাহায্য করতে লাগলো। তাদের অবস্থার, স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তন হয়ে গেল। এছাড়াও ইহুদীরা যে বারবার আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করেছে– নবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এমনকি কোনো কোনো নবীকে হত্যা পর্যন্ত করেছে, সে কথাও আল্লাহ্ পাক ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দিলেন। ফলে ইহুদীরা আরও ক্ষেপে গেল। তারা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ষড়যন্ত্র করল গোপনে নবীজীকে হত্যার।

কিন্তু আল্লাহ্র অসীম রহমত। সর্বক্ষেত্রেই তারা বিফল হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। তখন দয়ার নবী তাদের কোন শাস্তি না দিয়ে শুধু বললেন,– মদীনায় আর তোমাদের স্থান নেই। তোমাদের টাকা-কড়ি, ধন-রত্ন যা কিছু আছে সব নিয়ে তোমাদের এখান থেকে অন্য দেশে চলে যেতে হবে। অবশেষে ষড়যন্ত্রকারী বনু কায়নুকা আর বনু নাজির এই দুই শক্তিশালী ইহুদী গোত্রের সবাই মদীনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে গেল। রয়ে গেল শুধু বনু কুরায়জা নামে একটা গোত্র। এরাও খন্দক যুদ্ধের পরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নবীজী এদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি যা ছিল মদীনার মুসলমানদের সম্পত্তি নিয়ে, গৃহহারা মুহাজিরদের মধ্যে পরে ভাগ করে দিয়েছিলেন। ফলে মক্কার মুহাজিররা সবাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হলো। পরের ওপর আর নির্ভর করে থাকতে হলো না। মদীনার আনসারদের এই উদারতা মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয়।

ওদিকে মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে ইহুদীদের রাগ আরো বেড়ে গেল। তারা বাইরে গিয়ে দল পাকাতে লাগলো। মুসলমানদের যারা দুশমন তাদের সাথে যোগাযোগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। নানা রং চং লাগিয়ে মুসলমানদের চরিত্র, তাঁদের ধর্ম মত সম্বন্ধে এবং নবী করীম (সা) সম্পর্কে নানা ধরনের কুৎসা গেয়ে বেড়াতে লাগলো। মুনাফিকরাও যোগ দিলো তাদের দলে। ফলে– একের পর এক মুসলমানদের আরো কয়েকটা ছোট-খাটো যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হলো। যেমন– বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, খায়বরের যুদ্ধ, মু'তার যুদ্ধ, হুনায়নের যুদ্ধ ইত্যাদি। এমনিভাবে চলতে লাগলো সত্য আর-মিথ্যার লড়াই। আলো-আঁধারের লড়াই।



ঊনত্রিশ



খন্দকের যুদ্ধের পর মক্কার কুরাইশদের সাথে হিজরী ছয় সালে 'হুদায়বিয়া' নামক জায়গায় মুসলমানদের একটা সন্ধি হয়। এই সন্ধি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে বিখ্যাত। এই সন্ধির মূলে আছে একটা ঘটনা।

দেশের মায়া বড় মায়া। তাই না ? মাকে না দেখে সন্তান যেমন বেশি দিন থাকতে পারে না– মনটা উতলা হয়, জন্মভূমিতে পা রাখতে না পারলে মানুষের মনও তেমনি উতলা হয়ে ওঠে। জননী আর জন্মভূমির মত প্রিয় আর কিছু হয় না। মক্কার মুসলমানরা দেশ ছেড়ে মদীনায় এসেছিল ছ'বছর। তাই সবারই মনে মনে ইচ্ছা হচ্ছিল, একবার জন্মভূমি মক্কা ঘুরে আসে। কা'বাঘর জিয়ারত করে আসে।

সুযোগ এলো হজ্জের মাসে। প্রতি বছর হজ্জের সময় তিন মাসের জন্যে সারাদেশে ঝগড়া-ঝাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যেত। তখন যে যার খুশি মক্কায় যেতে পারতো। কেউ কাউকে আর বাধা দিতো না। কারণ– হজ্জের মাস, পবিত্র মাস। আর কা'বাঘর আল্লাহ্‌র ঘর। সেই ঘর জিয়ারতের অধিকার সবার। সেখানে শত্রু নেই, মিত্র নেই। আর এই নিয়মটা সবাই মেনে চলতো। তাই এই সুযোগে সবাই চাইলো একবার কা'বা শরীফ জিয়ারত করে আসে আর সেই সাথে আত্মীয়-স্বজনকেও একটু দেখে আসে।

রাসূলুল্লাহ্‌র মনের ইচ্ছাও ছিল তাই। সবাই যখন সেটা জানতে পারলো, তখন আর কি দেরি সয়; সাড়া পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ মিলে প্রায় চৌদ্দশো মুসলমান মক্কা যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেল। নবীজী কিন্তু সবাইকে সাবধান করে দিলেন,– 'যাচ্ছো! খুশির কথা! কিন্তু কেউ অস্ত্রশস্ত্র কিছু সাথে নিতে পারবে না।' তারপর বিস্‌মিল্লাহ্ বলে একদিন রওনা হলেন মক্কার পথে। আনন্দে সবাই উতলা। দু'চোখে মক্কার ছবি– কা'বার ছবি। মক্কার কাছাকাছি এসে নবীজী থামলেন। একজনকে আগে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। বললেন ঃ

ঊনত্রিশ



খন্দকের যুদ্ধের পর মক্কার কুরাইশদের সাথে হিজরী ছয় সালে 'হুদায়বিয়া' নামক জায়গায় মুসলমানদের একটা সন্ধি হয়। এই সন্ধি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে বিখ্যাত। এই সন্ধির মূলে আছে একটা ঘটনা।

দেশের মায়া বড় মায়া। তাই না ? মাকে না দেখে সন্তান যেমন বেশি দিন থাকতে পারে না– মনটা উতলা হয়, জন্মভূমিতে পা রাখতে না পারলে মানুষের মনও তেমনি উতলা হয়ে ওঠে। জননী আর জন্মভূমির মত প্রিয় আর কিছু হয় না। মক্কার মুসলমানরা দেশ ছেড়ে মদীনায় এসেছিল ছ'বছর। তাই সবারই মনে মনে ইচ্ছা হচ্ছিল, একবার জন্মভূমি মক্কা ঘুরে আসে। কা'বাঘর জিয়ারত করে আসে।

সুযোগ এলো হজ্জের মাসে। প্রতি বছর হজ্জের সময় তিন মাসের জন্যে সারাদেশে ঝগড়া-ঝাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যেত। তখন যে যার খুশি মক্কায় যেতে পারতো। কেউ কাউকে আর বাধা দিতো না। কারণ– হজ্জের মাস, পবিত্র মাস। আর কা'বাঘর আল্লাহ্‌র ঘর। সেই ঘর জিয়ারতের অধিকার সবার। সেখানে শত্রু নেই, মিত্র নেই। আর এই নিয়মটা সবাই মেনে চলতো। তাই এই সুযোগে সবাই চাইলো একবার কা'বা শরীফ জিয়ারত করে আসে আর সেই সাথে আত্মীয়-স্বজনকেও একটু দেখে আসে।

রাসূলুল্লাহ্‌র মনের ইচ্ছাও ছিল তাই। সবাই যখন সেটা জানতে পারলো, তখন আর কি দেরি সয়; সাড়া পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ মিলে প্রায় চৌদ্দশো মুসলমান মক্কা যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেল। নবীজী কিন্তু সবাইকে সাবধান করে দিলেন,– 'যাচ্ছো! খুশির কথা! কিন্তু কেউ অস্ত্রশস্ত্র কিছু সাথে নিতে পারবে না।' তারপর বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে একদিন রওনা হলেন মক্কার পথে। আনন্দে সবাই উতলা। দু'চোখে মক্কার ছবি– কা'বার ছবি। মক্কার কাছাকাছি এসে নবীজী থামলেন। একজনকে আগে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। বললেন ঃ

—কাফিরদের মতিগতি জানা দরকার। বলা যায় না— শেষে অঘটন কিছু ঘটে যেতে পারে। তুমি যাও। গিয়ে ওদের হাব-ভাব জেনে এসো।

লোকটা ফিরে এসে বলল,— ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাফিররা কিছুতেই মুসলমানদের মক্কায় ঢুকতে দেবে না। শুধু তাই-ই নয়। মুসলমানরা আসছে—এই খবর পেয়ে খালিদ বিন ওলীদ ইতিমধ্যে দু'শো ঘোড়সওয়ার সিপাই নিয়ে রওনা হয়েছে। আমরা তো অস্ত্রশস্ত্র কিছুই আনিনি। কি হবে এখন ?

নবীজী আর অগ্রসর হলেন না। হুদায়বিয়া নামের জায়গায় তাঁবু গাড়লেন। তারপর খোজা বংশের একজন অমুসলমান সরদারকে কুরাইশ সরদারদের কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে, তিনি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসেন নি। এসেছেন পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে ওমরা করতে। 'ওমরা' শেষ করে চলে যাবেন। এতে যেন তারা বাধা না দেয়।

এই খবর মক্কায় পৌঁছালে কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় নেতা ওরওয়া ইবনে মসউদ তাদের দূত হিসাবে নবীজীর সাথে কথা বলতে এলো। এসেই ঠাট্টাচ্ছলে বে-আদবের মত রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে কথা বলতে শুরু করল। সাহাবীরা এতে ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। কী এত বড় সাহস! আমাদের সামনে আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে বেয়াদবী! হযরত আবূ বকর তো চটে লাল। তাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন,— আদবের সাথে কথা বলুন। কারণ— তিনি তার মত সাধারণ মানুষ নন। তিনি আল্লাহ্‌র নবী। তিনি মুসলমানদের শ্রদ্ধেয় নেতা। ধর্ম-গুরু। তিনি একটি দেশের নেতা— একটি দেশের শাসনকর্তা। তাঁর সাথে হাসি-ঠাট্টা চলে না।

হযরত আবূ বকরের কথায় তার হুঁশ ফিরে এলো। ওরওয়া ইবনে মসউদ সেদিনের সেই মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাঁর ভক্তদের ভালোবাসা দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন। কোন রাজা-বাদ্‌শাহকেও তো তার প্রজারা এত সম্মান করে না!

মুগ্ধ-চিত্তে তিনি ফিরে গেলেন। নবীজীর মর্যাদার কথা কুরাইশদের জানালেন। তারা তখন আপোসের জন্যে মুসলমানদের তরফ থেকে একজনকে পাঠাবার প্রস্তাব দিল। নবীজী হযরত উসমান (রা)-কে পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা তাঁকে মক্কায় আটক করে রাখলো।

এদিকে হযরত উসমান (রা) আর ফিরে আসেন না দেখে সবাই অস্থির হয়ে উঠলো। এমন সময় খবর এলো, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। নবীজী তাঁর প্রিয় সাহাবার হত্যার সংবাদে বিচলিত হলেন। ঘোষণা করলেন— 'উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া ফরজ।' একটা বাবলা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ সবাই নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হাতে হাত দিয়ে ওয়াদা করলেন—তাঁরা ইসলামের জন্যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের জানমাল সব কিছু কোরবানী করে দেবে। এ হত্যা উসমানের হত্যা নয়। সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের-হত্যা। এই ওয়াদা 'বাবলার ওয়াদা' নামে খ্যাত। কিন্তু পরক্ষণে খবর এলো যে, না, সংবাদ মিথ্যা। হযরত উসমান বেঁচে আছেন।

কুরাইশদের তরফ থেকে একজন দূত এলো, তার নাম সোহায়েল ইবনে আসর। সে ছিল একজন চতুর রাজনীতিবিদ। কুরাইশদের পক্ষে তার সাথে মুসলমানদের একটা চুক্তি হলো। এই চুক্তিকেই হুদায়বিয়ার সন্ধি বলে।

এই লিখিত চুক্তিতে যে সব শর্ত ছিল– তা হলো ঃ

০ এ বছর মুসলমানেরা মক্কায় প্রবেশ না করে ফিরে যাবে।

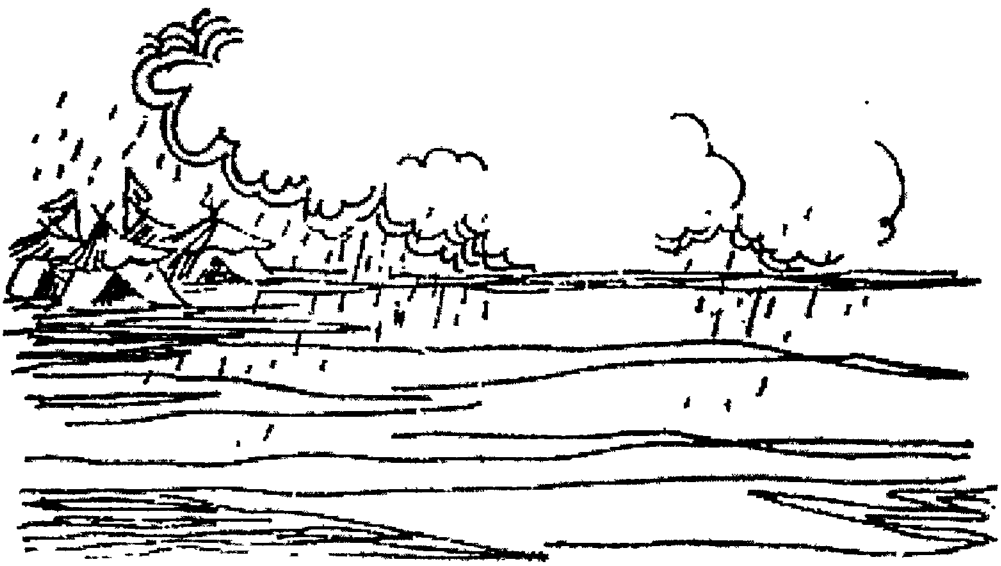
০ তাঁরা পরের বছর আসবে এবং মাত্র তিন দিন মক্কায় থাকবে।

০ সঙ্গে তলোয়ার ছাড়া আর কোন অস্ত্র আনতে পারবে না।

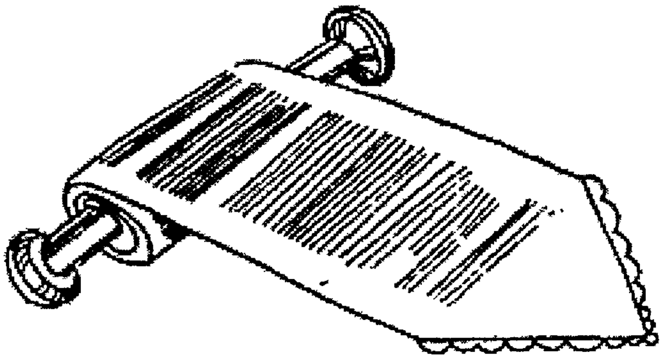
০ মদীনায় মক্কার কোন মুসলমান বা অমুসলমান চলে গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে, কিন্তু মদীনার মুসলমান মক্কায় চলে এলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।

০ আরবের সব গোত্র তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন পক্ষে যোগ দিতে পারবে।

নবীজীর এই চুক্তিকে অনেকে মুসলমানদের জন্য প্রথমে অসম্মানজনক ও ক্ষতিকর বলে মনে করেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, এই চুক্তির ফলে মুসলমানরা মক্কায় যাতায়াত করার সুযোগ পেল। কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের মেলামেশার সুযোগ হলো। তাদের পরিবর্তিত আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মভীরুতা কুরাইশদের মন ধীরে ধীরে জয় করে ফেললো। মহাবীর খালিদ বিন্ ওলীদ এবং আরও অনেকে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন কুরাইশরা আর মুসলমানদের শক্তিকে অস্বীকার করতে পারলো না। সত্যের আলো দিন দিন আরো জোরদার হতে লাগলো। ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দেশ হতে দেশান্তরে।



ত্রিশ



রাসূলে করীম (সা) এবার সত্য ধর্ম আল্লাহ্‌র দীন-ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত মারফত চিঠি পাঠালেন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী, রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস আর পারস্যরাজ খসরুর কাছে। এই সব চিঠি পাক আল্লাহ্ তা'আলার নামে তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসাবে তিনি পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করার জন্যে দাওয়াত।

বাদশাহ নাজ্জাশী ইসলামের পরিচয় আগেই পেয়েছিলেন। তাই আনন্দের সাথে তিনি ইসলাম কবুল করলেন। হেরাক্লিয়াস চিঠি পড়ে মুগ্ধ হন। নবীজী সম্পর্কে জানার জন্যে কুরাইশদের নামকরা নেতা আবূ সুফিয়ানকে ডেকে পাঠান। তিনি তখন সে দেশে ব্যবসা করার জন্যে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন নবীজীর এক নম্বর দুশমন, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু রোমান সম্রাটের প্রশ্নের কাছে তিনি মিথ্যা বলতে পারলেন না। যা সত্য তাই বলতে হলো। সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন ঃ

–তোমাদের দেশে যিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র নবী বলে দাবি করছেন, তাঁর বাণী ধনী লোকেরা গ্রহণ করছে, না গরীব সাধারণ মানুষ ?

আবূ সুফিয়ান বললেন, গরীব লোকেরাই বেশি।

হেরাক্লিয়াস তখন আপন মনে বলে উঠলেন, সত্যের বাণী বহনকারী পয়গম্বরদের অনুসারী সব সময় গরীবরাই হয়ে থাকে।

–আচ্ছা, তাঁর মন-মেজাজ, চলা-বলা কি বড় লোকদের মত ?

–জ্বী না। তিনি গরীব লোকের মতই সাধারণভাবে থাকেন। জাঁকজমক মোটেই পছন্দ করেন না।

–তোমাদের সাথে তাঁর যে সব যুদ্ধ হয়েছে, সেগুলোর ফলাফল কি ? তিনি জয়লাভ করেছেন, না তোমরা ?

–কখনও তিনি জয়ী হয়েছেন– কখনও আমরা।

–আচ্ছা, তিনি কি কখনো যুদ্ধের সময় কোনো অঙ্গীকার করে পরে তা ভেঙে ফেলেছেন ?

–জ্বী না। কথার বরখেলাপ তিনি কখনো করেন নি।

–কেউ তাঁর ধর্ম একবার গ্রহণ করে তারপর কি আবার ছেড়ে দিতে শুনেছ?

–না। দিনের পর দিন সংখ্যা তাদের বেড়েই চলেছে।

–আচ্ছা, তাঁর বংশ কেমন?

–আরবের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত বংশে তাঁর জন্ম।

–নবুওয়ত দাবি করার আগে তাঁকে কখনও মিথ্যা বলতে শুনেছ?

–জ্বী না।

–তাঁর বংশে আর কেউ কখনও নবুওয়তের দাবি করেছিল?

–জ্বী না।

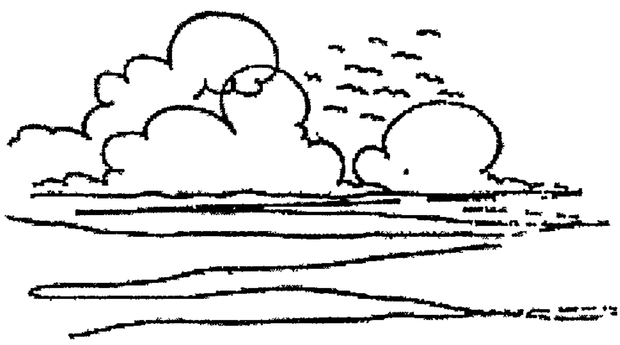
–কি বাণী তিনি প্রচার করে থাকেন?

–তিনি বলেন, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, পুরনো খারাপ রীতি-নীত ছেড়ে দাও। নামায পড়, যাকাত দাও আর সৎকর্ম করো।

হঠাৎ হেরাক্লিয়াস উচ্ছ্বাস ভরে চেঁচিয়ে উঠলেন– তিনি সত্যি আল্লাহ্‌র নবী। আমি বিশ্বাস করি, এমন একদিন আসবে যখন এই নবীর ধর্ম আজ আমি যেখানে বসে রয়েছি, এই পর্যন্ত এসে পৌঁছাবে। সম্ভব হলে আমি এখুনি তাঁর কদমবুসির জন্যে হাজির হতাম।

কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পারস্যরাজ খসরু। তিনি ছিলেন অগ্নিপূজক। নবীজীর চিঠি পড়ে রাজা রাগে অগ্নিশর্মা। অহংকারী বাদশাহ পবিত্র চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে নবীজীর দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। নবীজীর কাছে যখন এই খবর পৌঁছালো, তখন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। বললেন,– আল্লাহ্ একদিন খসরুর রাজ্যটাকেও ঐ চিঠির মতই টুকরো টুকরো করে দেবেন।

নবীজীর কথা সত্য হয়েছিল। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর সময়ে পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের অধীন চলে এসেছিল এবং সেখানে উড়েছিল ইসলামের জয় পতাকা। যে পতাকা আজ আবার সেখানে নতুন করে ইসলামী জাগরণ নিয়ে এসেছে।



একত্রিশ



মদীনার অদূরে খায়বার নামে একটা জায়গায় ইহুদীদের প্রধান ঘাঁটি ছিল। তারা মদীনার ইহুদীদের পরাজিত হতে দেখে আরবের কয়েকটা গোত্রকে নিজেদের দলে ভিড়ালো। তারপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন শুরু করলো।

তখন ছিল মুহররম মাস। নবীজী চৌদ্দশো মুসলমান নিয়ে তাদের মুকাবিলা করতে অগ্রসর হলেন। এই যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন শেরে খোদা হযরত আলী (রা)। শেষ পর্যন্ত ইহুদীরা হেরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলো। নবীজীর কাছে তাদের অপরাধের জন্যে মাফ চাইলো। আর প্রতিজ্ঞা করলো যে, ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা কখনো অস্ত্র ধরবে না। তবে নবীজীর কাছে একটা অনুরোধ জানালো যে, এখানে যেন তাদের থাকার অনুমতি দেওয়া হয়, অন্যদের মত তাড়িয়ে দেওয়া না হয়।

দয়ার নবী তাদের শুধু ক্ষমাই করলেন না– তাদের নিজ ধর্ম পালন করারও পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। ঘর-বাড়ি, জমি-জমা সব ফিরিয়ে দিলেন। শুধু একটা শর্ত আরোপ করলেন যে, তারা যে শস্য ফলাবে তার অর্ধেক খাজনা হিসাবে দিতে হবে। কিন্তু ইহুদীরা এমন একটা জাতি যে, এত মহানুভবতা দেখাবার পরেও তাদের হিংসার মনোভাব ছাড়লো না।

একবার হারিস নামে এক ইহুদী সর্দারের স্ত্রী নবীজীকে তার বাড়িতে দাওয়াত দিলো। তার মনের ইচ্ছা নবীজীকে নিজ হাতে খাওয়াবে। সে এমনভাবে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল যে, নবীজী দাওয়াত না নিয়ে পারলেন না। কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে সরল বিশ্বাসে দাওয়াত রক্ষা করতে গেলেন। কিন্তু সাহাবাদের একজন খাবার মুখে দেবার সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। নবীজীও মুখে খাবার নিয়েছিলেন। তাতেও বিষ মেশানো আছে বুঝতে পেরে তখুনি ফেলে দিলেন। তা সত্ত্বেও এর প্রতিক্রিয়া তাঁর দেহে হয়েছিল। এত তীব্র ছিল সেই বিষ। তবু দয়ার নবী অপরাধিনীকে স্ত্রীলোক বলে কোন শাস্তিই দেন নি। ক্ষমতায় থেকে এ রকম জঘন্য অপরাধীকে ক্ষমা করার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে পাওয়া যাবে না।

ইসলামের এই মহানুভবতা সকল জাতির– সকল মানুষের অনুকরণীয়। আজকের সভ্যতাগর্বী যে কোন শক্তিশালী জাতি– এ ক্ষেত্রে শুধু তারই রক্ত নয়– তার গোত্রকেও নিশ্চিহ্ন করে দিতো।

তা না হলে এক দেশে আর এক দেশের রাজপুত্র হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধতো না আর লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হতো না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও বাধতো না, যদি প্রতিটি জাতির মধ্যে ইসলামের শিক্ষা, মহানুভবতা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা থাকতো! থাকতো আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, সত্য, সুন্দর ও শান্তির প্রতি ভালোবাসা, মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং পরকালের প্রতি ভয়।

যা হোক, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এভাবে দু'বছর কাটলো। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী 'খোজা' নামক একটা গোত্রের সবাই মুসলমানদের দলে যোগ দিলো। কিন্তু 'খোজা' গোত্রের দুশমন 'বনু বকর' গোত্র যোগ দিল মক্কার কুরাইশদের দলে। তারপর হঠাৎ একদিন বনু বকর গোত্রের লোকেরা খোজাদের আক্রমণ করে বসলো আর তাদের সাথে কুরাইশরাও যোগ দিলো।

খোজারা ভয়ে কা'বাঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। কিন্তু সেখানেও তারা রেহাই পেল না। তাদের অনেকেই নিহত হলো। অথচ সন্ধির শর্ত মুতাবিক খোজা গোত্রকে রক্ষা করা এবং এই অন্যায় আক্রমণকে বাধা দেওয়া মক্কার কাফিরদের দায়িত্ব ছিল। খোজারা উপায় না দেখে ছুটে এলো নবীজীর কাছে। দয়ার নবী তাদের করুণ অবস্থা দেখে খুবই ব্যথিত হলেন।

তিনি কুরাইশদের নেতাকে বলে পাঠালেন,–এ হত্যা অন্যায়। হয় নিহত খোজাদের ক্ষতিপূরণ দাও– নয় বনু বকরদের দল ত্যাগ করো। আর দু'টোর একটাতেও যদি রাজী না হও– তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি তোমরা বাতিল করে দিয়েছো।

জবাবে কুরাইশরা জানিয়ে দিলো,– তারা আর সন্ধির শর্ত মানতে রাজী নয়।

রাসূলে আকরাম (সা) তখন মক্কা বিজয়ের জন্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। যে সমস্ত গোত্রের লোক মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল তাদেরকেও ডাক দিলেন। বললেন ঃ

সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর নানাভাবে জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা তিনবার মদীনা আক্রমণ করে আল্লাহ্‌র দীন ইসলাম নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে। সন্ধি করে সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করেছে। বারবার মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর নয়। আর তাদের কোন সুযোগ দেয়া উচিত নয়। এখন সময় এসেছে দুশমনদের বিরুদ্ধে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়ার এবং এর সমুচিত জবাব দেয়ার।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ঘোষণার পর মুহাজির ও আনসারদের এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর হিজরী আট সালের দশই রমযান (ইংরেজী ৬৩০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাস) দশ হাজার মুজাহিদের এক সু-সজ্জিত বাহিনী মক্কার পথে রওনা হলো। তার সিপাহ্‌সালার বা প্রধান সেনাপতি কে জানো? আর কেউ নয়, স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবী–রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)।

এবার লক্ষ্যস্থল– মক্কা মুয়াজ্জমা। বিশ্বমানবের মিলনতীর্থ বায়তুল হরম।

ওছফান ও জেদ্দার মাঝপথে মার্‌রুজ–জাহরান নামে একটা জায়গায় মুসলিম বাহিনী যখন পৌঁছাল তখন রাত হয়ে গেছে। চারদিক অন্ধকার। অন্ধকারে দুশমনদের গতিবিধি জানা সম্ভব নয়। তাই নবীজী হুকুম দিলেন– আগুন জ্বালাও।

দেখতে দেখতে দশদিকে দশ হাজার আগুনের মশাল জ্বলে উঠলো। জ্বলে উঠলো দীন ইসলামের লাল মশাল। মরু-ময়দানে সৃষ্টি হলো যেন অগ্নির সমুদ্র।

বত্রিশ



ওদিকে রাসূলের মক্কা অভিযানের খবর আগেই পৌঁছে গেছে কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ানের কানে। সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্যে তিনি গোপনে মক্কার সীমান্তে এসে পৌঁছালেন। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন হযরত আব্বাস (রা)-এর কাছে। হযরত আব্বাস (রা) বললেন ঃ

এবার আর তোমার রক্ষা নেই আবূ সুফিয়ান। চেয়ে দেখো–রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কি বিরাট বাহিনী! তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করবেন, তখন তোমাদের অবস্থাটা কি হবে– একবার চিন্তা করে দেখো।

আবূ সুফিয়ান তার পুরোনো দুশ্‌মনীর কথা মনে করে ভয়ে কেঁপে উঠলো। বললো ঃ এখন উপায় কি ?

—একমাত্র উপায় তাঁর পাক কদমে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়া। তিনি রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন। নিশ্চয়ই মাফ করে দেবেন।

—কিন্তু কি করে তাঁর কাছে পৌঁছাবো ? তার আগেই তো আমাকে শেষ করে দেবে।

হযরত আব্বাস (রা) বললেন—ভয় নেই। আমার সাথে এসো।

হযরত আব্বাস (রা)-এর খচ্চরের পিঠে চড়ে আবূ সুফিয়ান যেই মুসলমানদের এলাকায় ঢুকেছে, অমনি হযরত উমর (রা) দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন ঃ

–কে ও ? আল্লাহ্‌র দুশ্‌মন, আবূ সুফিয়ান ?

হযরত আব্বাস (রা) বেগতিক দেখে জোরে খচ্চর ছোটালেন। হযরত উমর (রা)ও ছোটালেন। একসাথে পৌঁছালেন নবীজীর কাছে। হযরত আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ানের হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করলেন। কিন্তু অন্যরা দাবি করল তার হত্যার। কারণ সে ইসলামের ঘোর শত্রু। বার বার মদীনার ওপর সে-ই আক্রমণ চালিয়েছে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মুসলমানদের

বিরুদ্ধে বিষ ছড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পর্যন্ত হত্যার হীন ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। তার ক্ষমা নেই। তাকে ক্ষমা করলে ক্ষমারই অবমাননা করা হবে।

হযরত আব্বাস (রা) বললেন,– আবূ সুফিয়ান ! এখনও সময় আছে। স্বীকার করো। সাক্ষ্য দাও– আল্লাহ্ এক। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবূ সুফিয়ান ! আল্লাহ্ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই– এ কথা স্বীকার করার মত সময় কি তোমার এখনো আসে নি ?

আবূ সুফিয়ান বললেন, আল্লাহ ছাড়া আর মাবুদ থাকলে নিশ্চয়ই এখন আমাদের সাহায্য করতে আসতো। এবার আমার ভুল ভেঙে গেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সত্যিই আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ্।

আবূ সুফিয়ান ইসলাম কবুল করলেন। আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের সংবাদে মুসলমানরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

পরদিন ভোরে দশ হাজার মুজাহিদ সৈন্য আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে মক্কা নগরীতে প্রবেশের জন্য অগ্রসর হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রক্তপাতের পক্ষপাতী নন। আবূ সুফিয়ান তাই রাসূলুল্লাহ্র কাছে গিয়ে বললেন,–ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি যদি আদেশ দেন– তা হলে আমি আগে গিয়ে কুরাইশদের বারণ করি, তারা যেন মুসলিম বাহিনীকে বাধা না দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি দিলেন। কারণ বাধা দিলেই যুদ্ধ হবে আর যুদ্ধ মানেই খুনখারাবি, লুঠতরাজ।

আবূ সুফিয়ান সবার আগে ছুটে গেলেন মক্কা নগরীতে। সেখানে গিয়েই প্রথমে ঘোষণা করলেন ঃ

ভাই সব! আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছি। মিথ্যার পেছনে ছুটে এতদিন আমরা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছি, এ কথা তোমরা ভালো করেই জানো। এখনও যদি মঙ্গল চাও, পুতুল পূজা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করো। ঐ দেখ, অপরাজেয় মুসলমানদের বিরাট ব্যাহিনী নগরীর দ্বারে পৌঁছে গেছে। তাকে বাধা দিতে গেলে, তোমরা সবাই শেষ হয়ে যাবে। মক্কা-নগরীতে বয়ে যাবে রক্তের স্রোত। আমাকে পরাজিত করেছে যে শক্তি, সে শক্তি মানুষের নয়। ঐ এক আল্লাহ্র ঐশী শক্তি আমার পাষাণ হৃদয়কেও মোমের মত গলিয়ে দিয়েছে। চুম্বকের মত ইসলাম আমাকে কাছে টেনে নিয়েছে। আর সময় নেই। এখন তোমরাই স্থির করো, কি করবে ?

এমন সময় মক্কাবাসীর কানে গগনবিদারী 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি আসতেই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বললো,- এখন উপায় ?

রসূলুল্লাহ্র পূর্বনির্দেশ মত আবূ সুফিয়ান বললে–

০ যে আমার ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।

০ যে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকবে– সে নিরাপদ।

০ যে অস্ত্র পরিত্যাগ করবে সে নিরাপদ।

০ যে মসজিদে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ। আর যে হাকিম বিন হাজামের ঘরে অথবা আবূ রোয়াইহার পতাকার নিচে আশ্রয় নেবে, সেও নিরাপদ থাকবে।

নেতার কণ্ঠে অভয়বাণী পেয়ে সবাই আশ্রয়ের সন্ধানে যে যেখানে পারলো, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালো। কেউ বা শহরের কাছাকাছি পাহাড়ে উঠে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সর্বনাশ! আর রক্ষা নেই। এবার মুহাম্মদ (সা) এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। সবাই দেখল অবিশ্বাসের চোখ মেলে, সে এক এলাহী কাণ্ড! পিপীলিকার সারির মত মুসলিম বাহিনী ঢুকছে মক্কা-নগরীতে। সাথে ঢাল-তলোয়ার তীর-বল্লম। হাতে ইসলামের জয়-পতাকা, কণ্ঠে গগনভেদী তক্‌বীরের আওয়াজ। পদাতিক অশ্বারোহী একের পর একটা বাহিনী আসছে। যেন শেষ নেই। কার সাধ্য তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়?

সহসা সামনে পড়ে গেল ইসলামের জানী দুশমন আবূ জেহেলের পুত্র ইকরামা। তার পিতৃহত্যার কথা সে ভোলেনি। সে আন্দাজ করতে পারেনি এদের সংখ্যা আর শক্তি। ভাবলো, এই তো সুযোগ বাহাদুরি দেখাবার জন্যে। হঠাৎ কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সে আক্রমণ করল মুসলমান সৈন্যদের। ফলে দু'জন মুসলমান অতর্কিত আক্রমণে শহীদ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসলমানরা। দেখতে দেখতে তাদের পক্ষের আটাশ জন কুরাইশ শেষ। তখন তারা প্রাণ নিয়ে যে যে দিকে পারলো, দে ছুট।

রাসূলে আকরাম (সা) রক্তপাত চাননি। তাঁর কাছে এ খবর যেতেই তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বীরকেশরী খালিদ তখন ঘটনাটা নবীজীকে শোনালেন। শুনে তিনি বললেন– আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা এটাই ছিল। এরপর মুসলমানরা বন্যার বাঁধভাঙা স্রোতের মত ঢুকে পড়লো মক্কায়। না জানি এবার মুহাম্মদ কি করে? খুনের বদ্‌লা হয় তো সারা মক্কাবাসীকেই দিতে হবে। ভয়ে সবাই লুকিয়েছে। রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। কোন বাধা নেই। মক্কা বিজিত। সামনে পবিত্র কাবা।

আল্লাহ্র রসূল মুক্ত কাবার দিকে তাকালেন। দুই চোখে তাঁর মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু গড়িয়ে এলো। আহা! এই সেই কাবা, আল্লাহ্র ঘর। দুনিয়ার কেবলা। যার জিয়ারত-ইচ্ছায় তাঁর প্রাণ এতদিন কেঁদে বেড়াতো। এই প্রিয় কা'বাঘর তাঁকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল। আজ কা'বা মুক্ত। আজ এই ঘরে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার। আজ সবাই তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায়। মক্কা একদিন তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল,– হত্যার জন্যে যারা হন্যে হয়ে বেড়াতো, কাঁটা বিছিয়ে পথ চলায় বাধা দিতো,– যারা তাঁকে শহরের বাইরে নির্জন পাহাড়ে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেছিল,– যারা তাঁকে পাগল বলে ঠাট্টা করতো, নানা প্রকার জুলুম আর অত্যাচারে তাঁর জীবন যারা অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, আজ তারা করজোড়ে নতমস্তকে অপরাধীর মত পথের দুধারে দাঁড়িয়ে। তাঁরই দেশবাসী এরা। আল্লাহ্র সাহায্যে আজ সেই মক্কা, সেই কা'বা বিজিত।

অন্ধকারের বুক চিরে এমনি করে আল্লাহ্ পাক আলোর রশ্মি নিয়ে আসেন। এমনি করে তাঁর প্রিয় বান্দাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেন। দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করেন। সত্যকে জয়যুক্ত করেন।

আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মাথা নত হয়ে এলো। 'আয় আল্লাহ্! তুমি সত্য—তুমি নিত্য। তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। কোন সাহায্যকারী নেই।'

তাঁর প্রিয় উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে তিনি কা'বা শরীফের চারদিক ঘুরে তওয়াফ করলেন। তারপর কা'বা ঘরের চাবি চেয়ে পাঠালেন। চাবি ছিল হযরত উসমান বিন তালহার আম্মার কাছে। চাবি এনে তিনি কা'বা ঘরের দরজা খুলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভিতরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে হযরত আবূ বকর, হযরত উসমান, হযরত উমর এবং হযরত বেলাল (রা)। হযরত খালিদ রইলেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বাইরে মুসলিম বাহিনী আর বিরাট জনতা।

কা'বা ঘরের ভিতরে ঢুকে তাঁরা কি দেখলেন? দেখলেন, কুরাইশদের উপাস্য তিনশো ষাটটা মূর্তি দাঁড়িয়ে। সারা দেয়ালে রঙ বেরঙের আঁকা বিচিত্র ছবি। হযরত উমর (রা) ছবিগুলো একে একে মুছে ফেলতে লাগলেন। আর নবী করীম (সা) করলেন কি? ওদের সেরা দেবতা হোবলের মূর্তির দুই চোখে হাতের তীর বিঁধিয়ে দিলেন। তারপর আল্লাহ্‌র কালাম উচ্চারণ করলেন ঃ

'বল (হে মুহাম্মদ)! সত্য এসেছে। মিথ্যা মুছে গেছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা অস্থায়ী।'

তারপর এক এক করে সব ক'টি মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দেয়া হলো। খানায়ে কাবা মূর্তির হাত থেকে মুক্ত হলো।

নবীজী এবার কাবা শরীফের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। জনতার উদ্দেশ্যে খোতবা দিলেন। বললেন ঃ

"আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি তাঁর ওয়াদা পালন করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই দুশমনদের পরাজিত করেছেন। তোমরা সবাই মনে রেখো, আজ থেকে তোমাদের পুরোনো বংশ-গৌরব, আভিজাত্য, রক্ত ও মালের প্রতিশোধ গ্রহণ যা কিছু ছিল, সব এই আমার পায়ের তলায় মিশে গেল।

হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! আল্লাহ্ তোমাদের অন্ধকার যুগের অহংকার আর বংশ-মর্যাদার গৌরব মুছে দিয়েছেন। সব মানুষই আদমের আওলাদ আর আদম মাটির তৈরি।'

তারপর তিনি কুরআন শরীফের একটি আয়াত পড়ে শোনালেন। যেখানে আল্লাহ্ বলছেন–

'হে মানুষ! আমি তোমাদের পয়দা করেছি। তারপর বিভিন্ন গোত্র ও বংশে ভাগ করে দিয়েছি– পরস্পরকে জানার জন্যে, অহংকারের জন্যে নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সেই সবচেয়ে বেশি সম্মানী, যে সবচেয়ে বেশি পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু জানেন এবং তোমাদের সব খবরই রাখেন। আল্লাহ্ আজ থেকে মাদক দ্রব্য বেচাকেনা তোমাদের জন্যে হারাম করে দিলেন।'

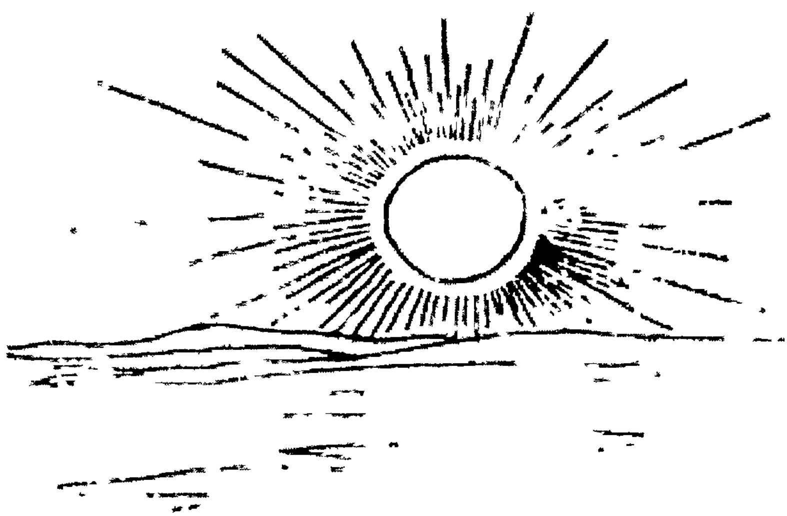
বক্তৃতা শেষ করে দয়ার নবী, মানুষের নবী, আলোর নবী আল আমীন মক্কার নগরবাসীর উদ্দেশ্যে অভয়বাণী ঘোষণা করলেন। বললেন ঃ

'হে মক্কাবাসীরা! শোনো। আমি এখানে প্রতিশোধ নিতে আসিনি। কিংবা তোমাদের দুশমন হিসাবেও আসিনি। আর যুদ্ধ নয়– আর প্রতিশোধ নয়। আমি তোমাদের সাথে সেই রকম ব্যবহারই করব, যে রকম ব্যবহার হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিসরে তাঁর ভাইদের সাথে করেছিলেন। তোমাদের প্রতি আমার কোন রাগ বা বিদ্বেষ নেই। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তোমাদের মাফ করে দেবেন। যাও– তোমরা মুক্ত।'

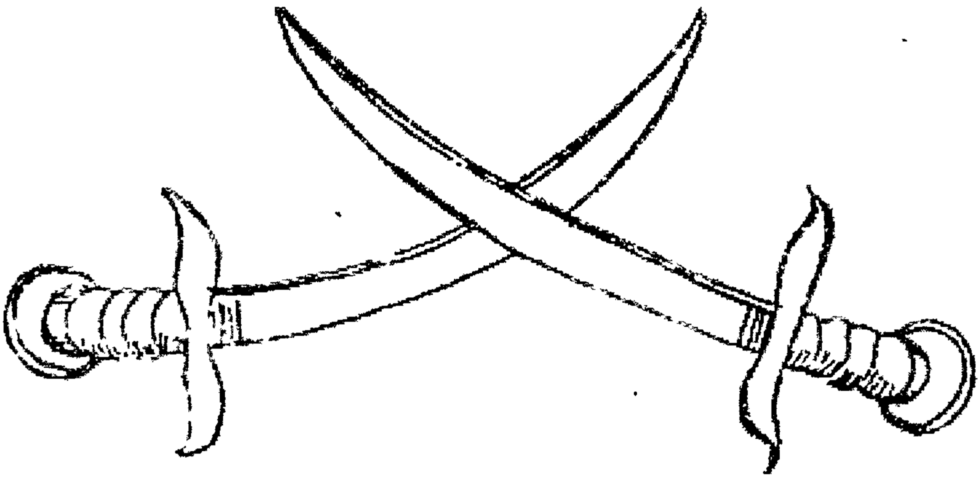
রাসূলুল্লাহ্র ক্ষমা ঘোষণায় সবার বুকে সাহস ফিরে এলো। তারা দলে দলে এসে তাঁর পাক কদম মুবারকে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। অনুতপ্ত হৃদয়ের অশ্রুতে বুক ভিজে গেল। তারা এবার সত্যকে, সুন্দরকে বরণ করে নিল। দীন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করল। শত্রু-মিত্র কেউ বাদ রইলো না। এমন কি, রাসূলুল্লাহ্র রক্তপিয়াসী আবূ জেহেলের পুত্র ইকরামা, সেও এলো। রাসূলে আকরাম (সা)-এর চাচা হযরত হামজার মস্তক ছেদনকারী নিষ্ঠুর ওয়াহ্শী, সেও এলো। তাদের সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দিলেন। তারপর প্রতিহিংসা-পরায়ণা রমণী– আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা, যে হযরত হামজার কলজে চিবিয়ে খেয়েছিল, তাকে পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করে ইসলামের কোলে আশ্রয় দিলেন।

এমন অপরূপ ক্ষমার নজির দুনিয়ার ইতিহাসে আর দু'টো খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন জাতির কোন মহাপুরুষের জীবনে দেখা যাবে না। এ একমাত্র সৃষ্টজগতের রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবী, মাহবুবে ইলাহী, রাহমাতুল্লিল আলামীনের পক্ষেই সম্ভব। সত্যের আলোকশিখা এবার সমগ্র মক্কার বুকে জ্বলে উঠলো চিরদিনের জন্যে। দূর হয়ে গেল পাপ-পংকিল অন্ধকার।

নবী করীম (সা) পনেরো দিন মক্কায় ছিলেন। তারপর মক্কায় মায়াজ ইবনে জাবাল (রা) নামে একজন সাহাবীকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মদীনায় ফিরে এলেন।



তেত্রিশ



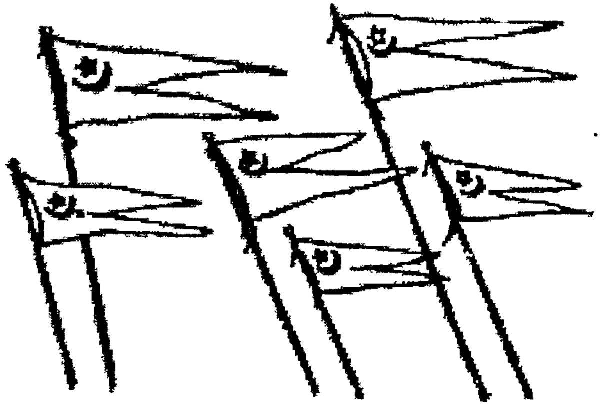
এরপর! মক্কা ও মদীনার যে সব গোত্রের লোক তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। কিন্তু এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু মরুচারী দুর্ধর্ষ গোত্র ছিল– যারা নিত্য-স্বাধীন বাধা-বন্ধনহীন গোত্রের। তারা সহজে কারো বশ্যতা স্বীকার করত না। এই রকম দু'টো বেদুঈন গোত্র ছিল। 'গোত্র দু'টির নাম—'হাওয়াজেন' ও 'ছাকীফ'। তারা মুসলমানদের সাথে শক্তিপরীক্ষায় নামলো। ফলে 'হুনায়ন' নামে একটি জায়গায় আবার যুদ্ধ হলো।

এই যুদ্ধে মুসলমানরা শত্রুদের খুবই তুচ্ছ মনে করল। কারণ মুসলমানরা সংখ্যায় তখন বিপুল। মক্কা জয়ের পর মনের মধ্যে অহংকার এসে গিয়েছিল। ভাবলো, এদের সাথে আবার যুদ্ধ কি! খেলতে খেলতে হারিয়ে দেব। আল্লাহ্ আলেম-উল-গায়েব। অহংকারীকে তিনি পছন্দ করেন না। তা'ছাড়া শক্তি আর সংখ্যার জোরে তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইতেও ভুলে গেল। ফলে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য এমনভাবে আক্রান্ত হলো যে, তারা হতভম্ব হয়ে গেল। হেরে যায় আর কী! সবাই চিন্তিত। এমন তো হওয়ার কথা নয়!

তখুনি তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তওবা করল। আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাত তুলে মাফ চাইলো। এবার সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে এলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডাকে মুসলমানরা আবার তাদের হারানো জোশ ফিরে পেল। ঈমানের বলে বলীয়ান বাহিনী তখন নতুন করে আল্লাহু আকবর বলে ঝাঁপিয়ে পড়লো দুশমনদের ওপর। মুসলিম বাহিনী এবার সহজেই জিতে গেল। এই যুদ্ধ হয় হিজরী আট সালে।

এই বছরেই নবীজীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল ইব্রাহীম। তিনি মাত্র দেড় বছর বেঁচেছিলেন।

চৌত্রিশ



শত্রু-মুক্ত আরব। দিকে দিকে ইসলামের জয়-পতাকা উড্ডীন। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ কারো কাছে মাথা নত করে না। ইসলামের শিক্ষা, আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত মানুষকে এবার জানানো দরকার। নবীজী দিকে দিকে লোক পাঠালেন।

তাঁদের মহান শিক্ষায় বর্বর, রক্ত-পিপাসু, পাপে আসক্ত আরববাসীর মন ও মানস বদলে গেল। তারা পরিণত হলো আল্লাহ্-ভীরু, শান্তি-প্রিয় এক সুশৃংখল জাতিতে। যেন নতুন মানুষ হিসেবে নব-জন্ম হলো। মানুষে মানুষে আর কোন ভেদাভেদ নেই। ধনী-গরীব, ছোট-বড়, আশরাফ-আতরাফে কোন তফাৎ নেই। কেউ কাউকে হিংসা করে না। কেউ কারো রক্তপানের জন্যে আর খোলা তলোয়ার হাতে ছুটে আসে না। কেউ আর মদ খায় না। সুদ খায় না। কন্যা জন্মালে পাপ বলে আর হত্যা করে না। নারীদের অসম্মান করে না। তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। সত্য আর শান্তির আলোকে সমগ্র আরববাসীর দেহ-মন আলোকিত। এ আরব এক নতুন আরব। মক্কা এখন আর পাপ-পুরী নয়। পবিত্র নগরী, শান্তির আলয়,– মক্কা মুয়াজ্জমা।

তাদের মনে এখন এক আল্লাহ্‌র ধ্যান। মুখে পাক কালেমার বাণী– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। চোখে ভাসে আলোর নবী আল-আমীনের চেহারা মুবারক। কানে বাজে তাঁর মধুর বাণী। তাঁরই পথে তারা চলে। তাঁরই কথা তারা বলে। তাঁর আদেশ, তাঁর নির্দেশ শোনার জন্যে মানুষের ঢল নামে। এখন আল্লাহ্ আর তাঁর রাসূল ছাড়া আর কিছুই তারা জানে না। জানতে চায় না।

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, ছুটে গেছে নবীজীর কাছে। বাপ কিংবা মা-বেটায় বিবাদ, ছুটে গেছে নবীজীর কাছে। পাওনাদার-দেনাদারে ঝগড়া– ছুটে গছে নবীজীর কাছে। নবীজী আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী বিচার করে দিয়েছেন। হাসিমুখে তারা রায় মেনে নিয়েছে।

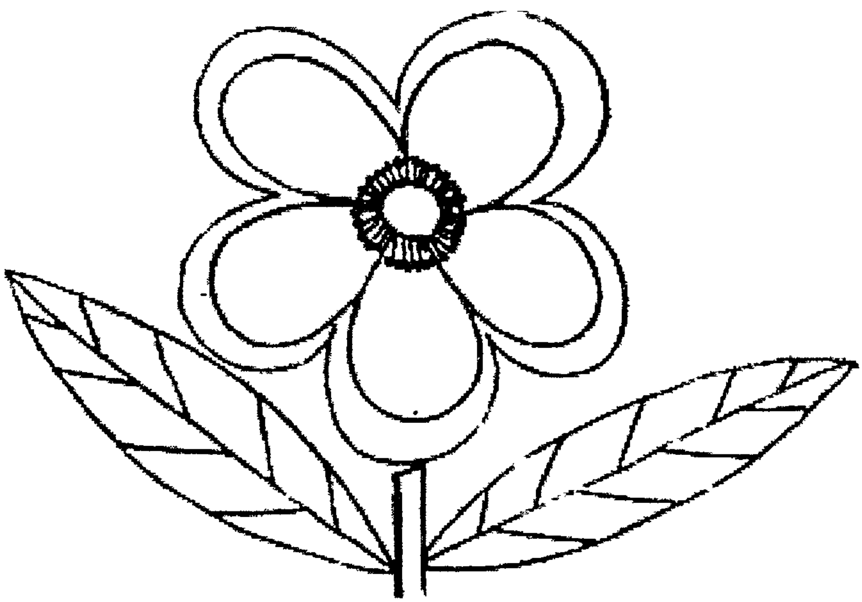
ছোট শিশুর আবদার গরীব বাপ-মা মেটাতে পারে না,– ছুটে গেছে নবীজীর কাছে। শিশু নবীজীর আদেশ মেনে নিয়েছে।

সামাজিক সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, ধর্মীয় সমস্যা, যখনই যে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে– সবাই ছুটে গেছে নবীজীর কাছে। কুরআনের আলোকে নবীজী সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্র পরিচালনা, বৈদেশিক নীতি, বাণিজ্য-নীতি, শিক্ষা-নীতি, যুদ্ধ-নীতি, শান্তি-চুক্তি, প্রজা পালন, নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব, নেতা নির্বাচন, সব কিছুতেই চাই নবী করীম (সা)-এর মতামত। কারণ- তাঁর মতামতই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ। যে নির্দেশ তিনি রেখে গেছেন ভাবী দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যে তাঁর হাদীস পাকে আর আল্লাহ্‌র কালাম পাক কুরআনুল করীমে। তিনি ছিলেন মানুষের নবী। একজন মানুষের মধ্যে যতগুলো সদ্‌গুণ থাকা প্রয়োজন– সবই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল।

তিনি ছিলেন নবীর নবী। প্রত্যেক নবীর গুণের সমষ্টি ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন হযরত আইয়ূব (আ)-এর মত কষ্টসহিষ্ণু, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মত হৃদয়বান, হযরত ইউসুফ (আ)-এর মত ক্ষমাশীল, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর মত ধর্মপরায়ণ, হযরত সুলায়মান (আ)-এর মত শক্তিশালী, হযরত ঈসা (আ)-এর মত বিনয়ী, হযরত জাকারিয়া (আ)-এর মত ন্যায়পরায়ণ এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মত অমায়িক।

এই কারণেই শত্রু হোক, মিত্র হোক, যে একবার তাঁর পবিত্র সাহচর্যে আসতো– সে-ই তার নিজের সত্তা ভুলে যেত। আল্লাহ্‌র রঙে তার দেহ-মন রেঙে যেত। সত্যের আলোয় হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠতো। ভুলে যেত দুনিয়ার ভালবাসা, মিথ্যা লোভ-লালসা। অহমিকা বিসর্জন দিয়ে পরিণত হতো আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দায়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্ম-নিবেদিত প্রকৃত মুসলমান।



পঁয়ত্রিশ



হিজরী দশ সাল। যিলকদ মাসের ২৫ তারিখ। নবী করীম (সা) জীবনের শেষ হজ্জে রওনা হলেন। সঙ্গে লক্ষাধিক লোক। সবারই এহ্‌রাম বাঁধা। ধনী-গরীব সবারই এক পোশাক। কে ছোট কে বড়, কে আমীর কে গরীব কিছুই চিনবার উপায় নেই। সন্ধ্যার আগে নবীজী আরাফাত ময়দানে পৌঁছলেন। লক্ষ কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হচ্ছে– 'আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আলহাম্‌দুলিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ'।

মক্কাবাসীরা ছুটে এলো। নবীজী এসেছেন,– এসেছেন আলোর নবী, দীন-দুনিয়ার বাদশাহ, সরওয়ারে কায়িনাত। তাঁকে এক নজর দেখবে, তাঁর বাণী শুনবে। নবী করীম (সা) আরাফাতের এক পাহাড়ের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। নিচে তাঁরই দেশবাসী, তাঁরই অনুসারী অগণিত আল্লাহ্‌র বান্দা। সেদিন ছিল আটই যিলহজ্জ। দু'দিন পরেই পবিত্র হজ্জ। কণ্ঠের মধুর স্বর ভেসে এল ঃ

'হে মানবমণ্ডলী' !

সবাই চমকে উঠল–ভাই নয়, দেশবাসী নয়, আরববাসী নয়, কিংবা মুসলমানও নয়। সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের উদ্দেশ্যে তাঁর সম্বোধন।

'তোমরা সবাই মন দিয়ে আমার কথা শোনো। কারণ পরের বছরে আবার এখানে তোমাদের সাথে মিলতে পারব কিনা, আল্লাহ পাক আমাকে সে সময় দেবেন কিনা, তা আমি জানি না।

হে লোক সকল!

আজকের এই দিন যেমন পবিত্র, এই মাস, এই শহর যেমন পবিত্র, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট না পৌঁছানো পর্যন্ত তোমাদের পরস্পরের জানমালও তেমনি পবিত্র জানবে। তোমরা জেনে নাও–

আইয়ামে জাহিলিয়াতের- অন্ধযুগের সব রকম কুপ্রথা আমার পায়ের নিচে আজ পুঁতে ফেলা হলো। তোমাদের সমস্ত রক্তপণ আজ থেকে মওকুফ করা হলো এবং সর্বপ্রথম আমি আমার বংশের রাবিয়া ইবনে হারিস বিন আবদুল মুত্তালিবের রক্তপণ মাফ করে দিলাম। অন্ধযুগের সুদ গ্রহণের নিয়মও রহিত করা হলো এবং সর্বপ্রথম আমার বংশের আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদের কারবার আজ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। তোমাদের কারও কাছে কারও আমানত থাকলে আমানতকারীকে তা ফিরিয়ে দেবে।

হে লোকসকল !

তোমরা তোমাদের নারীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমাদের মত তাদেরও তোমাদের ওপর দাবি রয়েছে। তোমাদের সাধ্যমত তাদের ভরণ-পোষণ করবে।

হে লোকসকল!

নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্যে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে তা ধরে থাকো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো জিনিস হচ্ছে,– আল্লাহ্‌র কিতাব আর তোমাদের রাসূলের সুন্নত। খবরদার! আমার পরে যেন পথভ্রষ্ট হয়ে তোমরা পরস্পর হানাহানি এবং মারামারি আরম্ভ করে দিও না। মনে রেখ, আমরা সকলেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হবো এবং তাঁরে কাছে তোমাদের কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে।

হে মানবমণ্ডলী!

প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। তোমরা সবাই এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কারো প্রতি অবিচার করবে না,– কেউ কারো হক নষ্ট করবে না।

হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মিথ্যা অহংকার, অহমিকা– সব নির্মূল করে দিয়েছেন। এখন বাপ-দাদার কীর্তি-কাহিনী নিয়ে গর্ব করার আর কিছুই নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,–

'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের এক আদম থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের বিভিন্ন সমাজে আর বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনে নিতে পার।' সুতরাং কোন আরববাসী কোন আরবের বাইরে অন্য কোন দেশের লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তেমনি কোন অনারবও আরববাসীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। কোন শ্বেতকায়ও কোন কৃষ্ণকায় লোকের চেয়ে কিংবা কোন কৃষ্ণকায়ও শ্বেতকায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আল্লাহ তা'আলার কাছে সেই শ্রেষ্ঠ, যে সবচেয়ে বেশি পরহেজগার অর্থাৎ যার অন্তর পবিত্র।

হে মানবমণ্ডলী!

নিজেদের দাস-দাসীর প্রতি খেয়াল রাখবে। তোমরা যা খাবে, যা পরবে– তাদেরকেও তাই দেবে।

তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। কারণ তোমাদের পূর্বেও এই কারণে অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই নগরীতে আর শয়তান তার পূজা পাবে না। তবে তোমরা ছোটখাটো কাজে তার আনুগত্য স্বীকার করবে এবং সে তাতেই খুশি হবে।

হে মুসলমানগণ!

আমার পর আর কোন পয়গম্বর আসবে না। তোমরা আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে। বছরে একমাস রোযা রাখবে—খুশি মনে ধন-দওলতের যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ্‌র ঘর খানায়ে কাবায় হজ্জ সমাপন করবে—নিজেদের ব্যবস্থাপকদের কথা মেনে চলবে এবং তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র যে সমস্ত হুকুম নাযিল হয়েছে সেগুলো মেনে চলবে। তাহলে তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে। অপরাধী ব্যক্তি এখন থেকে তার নিজের অপরাধের জন্যে দায়ী হবে। এখন পিতার বদলে পুত্র কিংবা পুত্রের বদলে পিতাকে দায়ী করা হবে না।

হে মানবমণ্ডলী!

শোন ! তোমরা– যারা এখানে উপস্থিত আছ, তাদের কর্তব্য হবে—আমার এই আদেশ ও নির্দেশ তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যারা আজ এখানে উপস্থিত নেই। কারণ তাদের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে, যে তোমাদের চেয়ে আমার এই কথা ভালোভাবে বুঝবে এবং তা যত্নের সাথে পালন করবে।'

একটু থেমে এবার নবী করীম (সা) সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

'ওহে মানবমণ্ডলী! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমার সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন। তখন তোমরা কি জবাব দেবে ? আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করেছি ?

সমবেত জনতা সমস্বরে বলে উঠলো,–

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দেব– আপনি আল্লাহ্র আদেশ সততার সাথে– সুন্দরভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আপনি রিসালাতের হক সম্পূর্ণভাবে আদায় করেছেন। আপনি আমাদের অশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

জনতার জবাব শোনার পর সরওয়ারে কায়িনাত, আখেরী নবী আসমানের দিকে নিজের পবিত্র শাহাদত আঙুল উঠিয়ে বললেন ঃ

'আয় আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। তুমি সাক্ষী থাকো। তুমি সাক্ষী থাকো।'

এমন সময় আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে কুরআন শরীফের এই আয়াত নাযিল হলো। যার মানে হচ্ছে ঃ

'আজ তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং আমার সব রকমের নেয়ামত তোমাদের ওপর বর্ষণ করলাম এবং একমাত্র ইসলামকেই তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।' এই আয়াত নাযিল হওয়াতে নবী করীম (সা) বুঝতে পারলেন যে, দুনিয়ার কাজ তাঁর শেষ হয়েছে। এবার আল্লাহ্ পাকের আহ্বান খুব শিগ্গিরই এসে পৌঁছাবে।

নবী করীম (সা) মক্কায় মোট দশ দিন ছিলেন। দশ দিন পর তিনি মদীনায় ফিরে গেলেন। প্রিয় নবীর সংগ্রাম শেষ। কর্তব্য সমাপ্ত। হযরত আদম (আ) যে সত্যের বীজ প্রথম দুনিয়াতে পুঁতেছিলেন, এতদিনে সেই সত্য– সেই ধর্ম আজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত। ফুলে-ফলে বিকশিত। দীন ইসলাম আজ জয়যুক্ত। কুসংস্কারমুক্ত এক নতুন সমাজ, এক নতুন জাতি দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। তাদের এক আল্লাহ্, এক রসূল, এক কালেমা, এক কিতাব, এক আইন। নবীজী দু'চোখ ভরে দেখলেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করলেন আল্লাহ্র সেই বাণী ঃ

'যখন আল্লাহ্র সাহায্য আর জয় এসে পৌঁছাবে, তখন তুমি দেখবে, দলে দলে লোকেরা আল্লাহ্র দীন গ্রহণ করছে। তখন তুমি প্রশংসার সাথে তোমার প্রতিপালকের তসবীহ্ পাঠ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও তওবা কবুলকারী।'

এবার ঘরে ফেরার পালা। নবীজী বুঝতে পারলেন, আর দেরি নয়। মদীনায় ফিরে যাবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হলেন।

ছয়ত্রিশ



হিজরী এগারো সাল। নবী করীম (সা)-এর বয়স এখন ৬৩ বছর। সফর মাস শুরু হতে দু'দিন বাকি। নবীজী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। বিবি আয়েশার ঘরে নবীজী শুয়েছিলেন। কাছে বসে আছেন হযরত আলী আর আল-ফজল। একটু পরে আবার নবীজীর জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি ইশারায় মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালতে বললেন। তারপর একটু সুস্থ-বোধ করতেই তিনি উঠে বসলেন। বললেন,– আমাকে মসজিদে নিয়ে চলো। তখন জোহরের ওয়াকত। তাঁরা দু'জনে নবীজীকে দুই দিকে ধরে মসজিদে নিয়ে গেলেন। অতি কষ্টে মিম্বরে উঠে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) বললেন ঃ

হে মুমিনগণ! আমি যদি কোনদিন তোমাদের কাউকে কোন আঘাত করে থাকি– তাহলে আজ আমার এই পিঠের ওপর আঘাত করে তার প্রতিশোধ নিতে পারো। আমি যদি কারও সম্মানের হানি করে থাকি, সেও তার প্রতিশোধ নিতে পারো। আর আমি যদি কারও বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে থাকি– সেও তার দাবি আদায় করে নিতে পারো। তোমরা ভয় করো না, লজ্জা করো না। তোমরা মনে করো না যে, এতে আমি অসন্তুষ্ট হবো কিংবা রাগ করবো। তোমরা নির্ভয়ে তোমাদের দাবি পেশ করতে পারো।

সবাই হতবাক। এমন কথা তো তারা কখনো শোনেনি। রাহমাতুল্লিল আলামীন যিনি, নিষ্পাপ নবী যিনি, তিনি কি কারও ওপর কোন অন্যায় করে থাকতে পারেন ? সবাই নিরুত্তর। নামাযের পর নবীজী পুনরায় দাবি পেশের আহ্বান জানালেন। তখন একজন দাঁড়িয়ে জানাল ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আমার তিনটি দিরহাম পাওনা আছে।

নবী করীম (সা) তখুনি তাকে তিনটি দিরহাম দিয়ে দিলেন। বললেন, কিয়ামতের দিন লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা দুনিয়ায় লজ্জিত হওয়া অনেক ভালো।

তারপর রাসূলে আকরাম (সা) আল্লাহ্ পাকের কাছে দু'হাত তুলে মুনাজাত করলেন। মুনাজাতের শেষে বললেন, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাকে দুটো জিনিসের মধ্যে একটা বেছে নিতে বলেছেন। দুনিয়া ও তার সমুদয় সম্পদ অথবা আল্লাহ ও আখিরাতের সম্পদ। বান্দা আল্লাহ্র সান্নিধ্যই বেছে নিয়েছে।

এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রা) কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন–এবার প্রিয় নবীজী আমাদের ছেড়ে আল্লাহ্র কাছে চলে যাবেন। সকলে অবাক। আবূ বকর কাঁদেন কেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর (রা)-কে দরদভরা কণ্ঠে বললেন, 'শান্ত হও, আবূ বকর! তুমি তোমার ধন-দওলত দিয়ে আর সাথী হিসেবে সুখে-দুঃখে, বিপদে আপদে সব সময় যে সাহায্য আমায় করেছ– তা আমি কখনও ভুলব না। আমি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী।' একটু থেমে আবার ধরা গলায় বললেন, 'তোমরা ভয় করছ যে, তোমাদের পয়গম্বর ইন্তিকাল করতে পারেন। কিন্তু আমি কি চিরকাল তোমাদের মধ্যে থাকবো? আমার আগে যে সব নবী দুনিয়ায় এসেছিলেন– তাঁরা কি আজো আছেন? তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব শেষ করে কি আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাননি? প্রত্যেক মানুষই মরণশীল। আমাদের আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যেমন ফিরে যেতে হবে, তোমাদের সবাইকেও তেমনি তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।' আবার একটু থামলেন। তারপর পুনরায় বললেন, 'আমার হায়াত যেমন তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক, আমার মওতও তেমনি তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। কারণ, মৃত্যুর পরে তোমাদের আমল অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমরা কে কি করেছ তা আমাকে দেখানো হবে। যদি আমার কোন উম্মতের গোনাহ্ দেখতে পাই তখন আমি তার জন্যে আল্লাহ্ পাকের কাছে মাফ চাইব।'

আর কোন নবী এমন কথা বলেন নি। এ জন্যেই তো তিনি দয়ার নবী, দীন-দুনিয়ার নবী। আরো অনেক উপদেশ দিয়ে নবীজী ঘরের মধ্যে ফিরে গেলেন। তারপর থেকে অসুখ তাঁর ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলো আর তিনি বাইরে আসতে পারলেন না। প্রিয় নবীকে দেখতে না পেয়ে সবাই পাগলের মত অস্থির হয়ে উঠলো। তাঁকে এক নজর দেখার জন্যে মুসল্লীরা দেওয়ালে জানালা কেটে ফেললো। নবীগৃহের অন্যান্য সাহাবীও নবীগৃহের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে বেশ কয়েকটা ছিদ্র করলেন।

নবীজী যখন এসব দেখতে পেলেন, তখন বললেন, 'শুধু আবূ বকরের ঘরের জানালা ছাড়া আর সব ছিদ্র ও জানালা বন্ধ করে দাও। সঙ্গী হিসেবে সে আমার কাছে শ্রেষ্ঠ।' তারপর ইরশাদ করলেন, 'তোমরা জেনে রাখো, বহু জাতি আজ তাদের নবীদের কবর ইবাদতের ঘর বানিয়ে তাঁদের পূজা শুরু করেছে। সাবধান! তোমরা যেন তা কর না। তোমাদের কেউ আমার বন্ধু নও। যদি কেউ বন্ধু হতো, তাহলে আবূ বকরকেই আমি বন্ধু হিসেবে বেছে নিতাম। আল্লাহ্ আমাকে হযরত ইবরাহীমের ক্ষুদ্র বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে দুনিয়ায় ইসলামী ভ্রাতৃত্ব আর বন্ধুত্বই শ্রেষ্ঠ।'

হযরত উমর (রা) এবং হযরত আব্বাস (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ'! অন্তত একটা ছিদ্র থাক। তাহলে নামাযে বের হবার সময় সবাই আপনাকে দেখতে পারবে।' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'না। যা বলছি তা আমার কথা নয়।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুখের মূলে ছিল কিন্তু সেই ইহুদী রমণীর দেওয়া বিষের ক্রিয়া। যে তাঁকে একদিন জোর করে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যা হোক– তবু যতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ছিল, যতক্ষণ হেঁটে বেড়াবার শক্তি ছিল– ততক্ষণ তিনি মস্জিদে এসে নামায পড়তেন।

নবীজী বার বার বেহুঁশ হয়ে পড়ছিলেন। জ্ঞান ফিরলেই জিজ্ঞেস করছিলেন– নামায কি হয়ে গেছে? হযরত বেলাল (রা) তাঁর মধুর কণ্ঠে করুণ সুরে এশার আযান দিলেন। কিন্তু নবীজী কই?

নবীজী আযান শুনে উঠতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। আবার জ্ঞান হারালেন। মুসল্লীরা এশার নামাযের জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন। নবীজীকে ছাড়া নামায় পড়া তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। নবীজীর জ্ঞান আবার ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন–'নামায কি হয়ে গেছে ?' নামাযের প্রতি কি ভালবাসা!

সবাই বললে, জ্বী-না ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছেন। রাসূলে আকরাম (সা) তখন ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন,– 'আবূ বকরকে নামায পড়াতে বল।'

হযরত আয়েশা (রা) এ কথা শুনে বললেন—তাঁর দীল খুবই নরম। তিনি তো আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে পারবেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তবু বললেন—'আবূ বকরকেই নামায পড়াতে বলো।'

রোগ-শয্যায় নবী করীম (সা) কারো মতে আট দিন, কারো মতে দশ দিন, আবার কারো মতে তেরো-চৌদ্দ দিন ছিলেন। রোগ-যন্ত্রণা যখন খুব বেশি হলো– তখন হযরত আলী (রা)-কে কাছে ডেকে তাঁর কোলে পবিত্র মাথা রাখলেন। আহা! নবীজীর কপাল বারবার ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। চেহারা মুবারকের রঙ পাল্‌টে যাচ্ছিল। নবীদুলালী বিবি ফাতিমা আব্বার এই কষ্ট দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলেন।

পুত্র হাসান আর হোসাইনকে কাছে নিয়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বললেন–

আব্বাজান! আপনি চলে গেলে কে আর আপনার কন্যা ফাতিমাকে দেখবে ? কে আর আপনার হাসান-হোসাইনকে আদর করবে ?

নবী করীম (সা) প্রাণপ্রিয় কন্যার আকুল কান্নায় ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। ইশারায় কাছে ডাকলেন। তারপর তাঁর মাথায়, পিঠে পবিত্র হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার পরশ দিলেন। ধীর-কণ্ঠে বললেন– 'ধৈর্য ধরো, মা! তোমাকে-- আমার-- খোশ্-- খবর-- দিচ্ছি-- যে, তুমিই-- সবার-- আগে-- আমার-- সাথে-- মিলবে।'

নবীজী আবার ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ করলেন। কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। নবী-পত্নীদের ক্রন্দনে– সাহাবীদের আর্তনাদে ঘরে-বাইরে করুণ দৃশ্য তখন। বাইরে জনতা। নবীজীকে এক নজর দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তারা ঘরের দরজা ভেঙে ফেলে ঢুকতে চায়। বিবি ফাতিমা (রা) আব্বার কানের ওপর মুখ রেখে আবার আব্বাজান বলে কেঁদে উঠলেন। নবীজী চোখ খুললেন। বললেন, 'কেঁদো না মা। তোমার-- কান্নায়-- বেহেশ্‌তও-- কাঁদে।' বিবি ফাতিমার চোখের পানি নিজের পবিত্র হাতে মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন–

আমরা-- আল্লাহ্‌র-- কাছ-- থেকে-- এসেছি। আবার-- আল্লাহ্‌র-- কাছেই-- ফিরে-- যাবো।

নবীজী আবার চোখ বন্ধ করে নিলেন। এমন সময় আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আদেশ হলো–

'হে রাসূল! যদি চাও, তবে দুনিয়াতেই থাকো। আর যদি না চাও, তবে আমার কাছে চলে এসো।'

রাসূলুল্লাহ্‌র পবিত্র কণ্ঠে শোনা গেল– 'ইয়া রব! আমি তোমার কাছেই যেতে চাই।'

সামনে একটা পানির পাত্র রাখা ছিল। তিনি তাতে দু'হাত ডুবিয়ে নিজের পবিত্র মুখমণ্ডল মসেহ্‌ করতে করতে উচ্চারণ করলেন–

–লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌! মৃত্যুর যাতনা সত্য।

তারপর অতি কষ্টে দুই হাত ওপরে উঠিয়ে মুনাজাতের ভঙ্গিতে বললেন– আল্লাহুম্মা রফিকুল আ'লা। আল্লাহুম্মা রফিকুল আ'লা। আল্লাহুম্মা রফিকুল আ'লা। হে আল্লাহ! পরম বন্ধু আমার!

তিনবার বলা শেষ হতেই নবী করীম (সা)-এর হাত দুটো নিচে নেমে এলো। আর সাথে সাথেই তাঁর পবিত্র রূহ মুবারক ধুলা-মলিন মাটির দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে চলে গেল (ইন্না লিল্লাহি অ-ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সেদিন ছিল সোমবার। বেলা দুপুর। রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ। হিজরী এগারো সাল। নবীজীর বয়স তখন ৬৩ বছর। আলোর নবী আল-আমীন আর নেই। মরুর সূর্য ডুবে গেল। চারদিকে নেমে এলো শোকের আঁধার। উঠলো মাতমের রোল। হযরত আবূ বকর (রা) সে সময় নিজের বাসায় ছিলেন। খবর পেয়েই কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন। হযরত উমর (রা) উন্মাদের মত তলোয়ার ঘোরাতে থাকেন আর বলেন, 'যে বলবে, নবীজী নেই– তার গর্দান আমি উড়িয়ে দেব।' হযরত উসমান (রা) ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগলেন। হযরত আলী (রা) শোকে বোবা হয়ে গেলেন। বিবি ফাতেমা (রা) কেঁদে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। আর হযরত হাসান-হোসাইন (রা) 'নানাজান, নানাজান' বলে ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। হযরত বেলালের কণ্ঠে আর আযানের সুর ফোটে না। কান্নার ভারে বার বার সুর কেটে যাচ্ছে। সে এক করুণ দৃশ্য। যেখানে নবীজী নেই– সেখানে যেন কিছুই নেই। আশা নেই, ভাষা নেই, আলো নেই। সব অন্ধকার! সবার নীরব প্রশ্ন যেন–

সূর্য কই ? কে করিল অন্ধ এই আরম্ভের প্রভা ?
কাঁদে মক্কা মুয়াজ্জমা, কাঁদে ঘর কা'বা।

প্রকৃতিরও মুখ ভার ঃ

তায়েফের পথ কাঁদে– পদ-রেণু বুকে ধরি তাঁর–
হেরার গুহায় পুনঃ নামে ঘন ঘোর আঁধিয়ার।

কিন্তু আলোর নবীর বিরহে পৃথিবী কাঁদলে কি হবে ? ওদিকে–

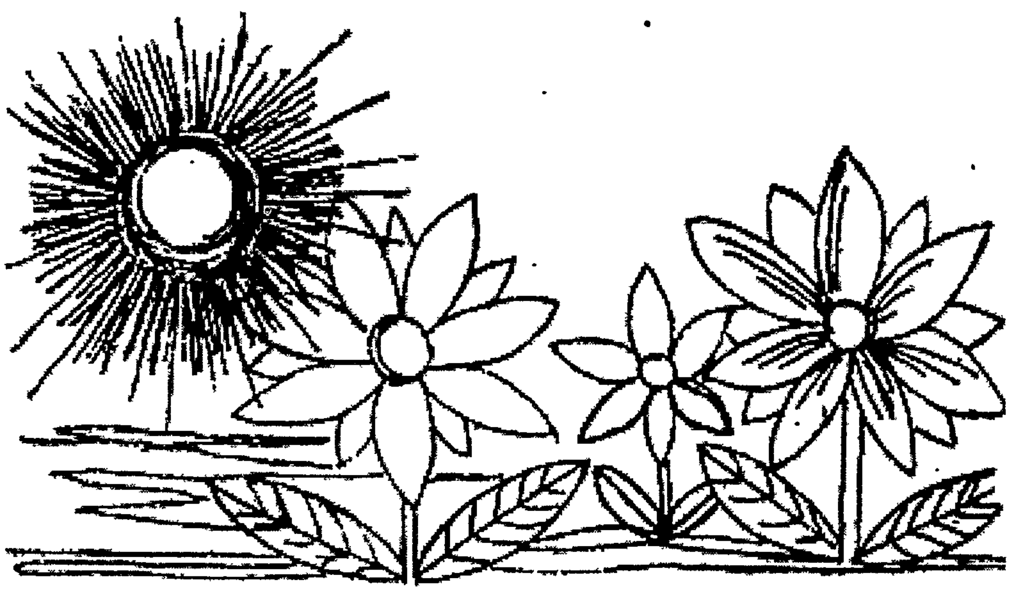
দূরে অলক্ষ্যে– দাঁড়ায়ে সেই নূর মনোরম
বেদনার বিনিময়ে ডাকে তাঁরে– 'এসো প্রিয়তম!
মর্ত্যের নও শুধু,– স্বর্গও স্মরে অবিরাম
দরূদের ফুলে তোমা'– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

সেখানেও তাঁর প্রয়োজন আছে। আমাদেরই জন্যে। তাঁর প্রিয় উম্মতের জন্যে। নইলে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবে কে ? কিয়ামতের দিনে এই পাপী উম্মতের জন্যে তিনি একা ছুটে বেড়াবেন–

কেঁদে বেড়াবেন– 'ইয়া উম্মতী! ইয়া উম্মতী' বলে। আর কোন নবী তাঁর উম্মতদের জন্যে এমন করে কাঁদবেন না। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে– তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। তিনি যাতে দুঃখ পান তেমন কাজ না করা।

কারণ– আমাদের আমল তো তাঁকে রোজই দেখানো হচ্ছে।

এবার দেখা যাক– তিনি কি বলে গেছেন। কিভাবে চলেছেন। কিভাবে সংসারে, সমাজে জীবন কাটিয়েছেন। আমরাও সেগুলো জেনে নিই এবং সেভাবে চলার চেষ্টা করি। তাহলে তিনি খুশি হবেন। আর তিনি খুশি হলেই আল্লাহ্ও খুশি হবেন। তখন দুনিয়া ও আখিরাতে আমরাও শান্তিতে থাকতে পারব। সব কাজেই অলক্ষ্যে আমরাও আল্লাহ্র সাহায্য পাবো।



সাঁইত্রিশ

আগেই বলেছি, নবী করীম (সা) সব দিক দিয়েই একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন মানুষের জন্যে এক বিশেষ রহমত স্বরূপ। একটি জীবন্ত কুরআন। তাই তাঁর সব কিছুই মুসলমানদের অনুকরণীয় এবং আল্লাহ্ পাকও তাই পছন্দ করেন। দুনিয়ার সকল জাতির মানুষ যেদিন তাঁর শিক্ষাকে, তাঁর আচার-ব্যবহারকে অনুসরণ করতে শিখবে, সেই দিনই কেবল এই দুনিয়া শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত হবে। তার আগে নয়। মনীষী জর্জ বার্নার্ড শ' বলেছেন,--- 'আমি বিশ্বাস করি, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর মত কোন ব্যক্তি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি এর সমস্যাগুলো এমনভাবে সমাধান করতে পারতেন– যাতে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি এবং সুখ দুনিয়ার মানুষ উপভোগ করতে পারত।' কারণ–

রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) ঃ

- সর্বদা সত্য কথা বলতেন।
- অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করতেন না।
- আমানতের খেয়ানত করতেন না।
- অনাথ-এতিমদের ভালবাসতেন।
- ভালবাসা দিয়েই মানুষের মন জয় করতেন।
- সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন।
- বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন।
- অযথা কথা বলতেন না এবং অল্প কথায় মনের ভাব প্রকাশ করতেন।
- সর্বদা বিনয়ের সাথে কথা বলতেন।
- ছোট-বড় সবাইকে সবার আগে সালাম করতেন এবং কেউ সালাম দিলে হাসিমুখে জবাব দিতেন।
- লোভকে প্রশ্রয় দিতেন না।

০ মুক্ত হাতে দান-খয়রাত করতেন।

০ কেউ পীড়িত হলে দেখতে যেতেন এবং তার সেবা করতেন।

০ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গরীবদের সাহায্য করতেন।

০ বয়সে যারা বড়– তাদের শ্রদ্ধা করতেন।

০ কেউ দাওয়াত দিলে কবুল করতেন। জাতি-ভেদ বিচার করতেন না কিংবা ধনী-গরীব পার্থক্য করতেন না।

০ সবচেয়ে বড় শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন।

০ কখনও মুখে কোন খারাপ কথা বা কড়া কথা উচ্চারণ করতেন না। কোন খারাপ কথা শুনতেনও না।

০ তাঁর মধ্যে অহংকার, হিংসা-দ্বেষ ছিল না। পরের নিন্দা কখনও করতেন না।

০ ব্যক্তিগত কারণে কাউকে তিরস্কার অথবা কারো প্রতি জুলুম বা দুর্ব্যবহার করতেন না।

০ তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, ন্যায়পরায়ণ ও সাহসী।

০ কোন কাজকেই ছোট মনে করতেন না। নিজের কাজ নিজে করতেন। কোন কাজের জন্য কাউকে হুকুম করা পছন্দ করতেন না।

০ দাস-দাসীকে যে খাবার, যে পোশাক দিতেন, নিজেও তাই ব্যবহার করতেন।

০ আহারের পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ' এবং পরে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন।

০ তিনি সাধারণ পোশাক পরতেন। জাঁকজমক পছন্দ করতেন না এবং সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন।

০ সর্বদা মাথা নিচু করে হাঁটতেন।

০ কেউ কোন উপহার দিলে তিনি তার প্রতিদান দিতেন।

০ তিনি ধীরে ধীরে প্রতিটি কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন।

০ কখনও শব্দ করে জোরে হাসতেন না।

তিনি কিভাবে চলতেন তারই কয়েকটা তোমাদের শোনালাম। আমরা যাতে জীবনের চলার পথে পথভ্রষ্ট না হই, সে জন্যেও আলোর নবী আল-আমীন আমাদের জন্যে কিছু আলোর বাণীও রেখে গেছেন। সেগুলোও আমাদের জানা দরকার। মেনে চলা দরকার। তাহলে সমস্যার অন্ধকারে আর পথ হারাবার ভয় থাকবে না। ঘরে-বাইরে, সমাজে সংসারে, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই শান্তি পাবো।

রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন– 'আমার কথাগুলি তোমাদের বিধান, আমার দৃষ্টান্ত তোমাদের নীতি এবং আমার জীবনটা সত্যেরই প্রকাশ। তোমরা শুনে রাখো–

০ একজন মুসলমানের ওপর আর একজন মুসলমানের ছয়টি হক আছে। সে যে দেশের কিংবা যে ভাষার হোক। সে হকগুলো হচ্ছে ঃ (১) একজন আর একজনকে দেখলে সালাম দেবে, (২) দাওয়াত দিলে কবুল করবে, (৩) কোন পরামর্শ চাইলে ভালো পরামর্শ দেবে, (৪) হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে 'ওয়া ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে, (৫) পীড়িত হলে দেখতে যাবে ও তার সেবা করবে এবং (৬) মারা গেলে তার দাফনে শরীক হবে।

তিনি বলে গেছেন ঃ

০ মুনাফিকের লক্ষণ হচ্ছে তিনটি। যখন সে কথা বলে– মিথ্যা বলে। ওয়াদা করে ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং কেউ কিছু জমা রাখলে তা নষ্ট করে ফেলে।

০ যারা লাভের আশায় খাদ্য-দ্রব্য আটক করে রাখে, তাদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসে।

০ তোমরা অন্যের সম্বন্ধে কখনো খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কারো খারাপ সংবাদে খুশি হয়ো না। কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করো না, কোন জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে সংকট সৃষ্টি করো না। একে অন্যকে হিংসা করো না। একজনের অসাক্ষাতে তার নিন্দা করো না। সকলে এক আল্লাহ্‌র বান্দা এবং ভাই-ভাই হিসাবে বাস করো।

০ অন্যায়, অনাচার এবং অযথা বিদ্রোহ করার জন্যে যারা মানুষকে ডাকে এবং এর জন্যে সংগ্রাম করে ও মৃত্যুবরণ করে, তারা আমার উম্মত নয়।

০ আদম-সন্তান মাত্রই কমবেশি পাপ করে থাকে। কিন্তু পাপীদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা পাপ কাজ করার পর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয় এবং তওবা করে।

০ তোমাদের মধ্যে পশুত্বের অংশ আছে—ফেরেশতার অংশও আছে। ভিতরের পশু প্রবৃত্তিকে সরিয়ে ফেলতে পারলে—তুমি ফেরেশ্‌তাকেও পেরিয়ে যেতে পারবে।

০ অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা, সবচেয়ে উত্তম জিহাদ।

০ যে তরুণ প্রবীণদের বয়সের জন্যে সম্মান করে, আল্লাহ্ তার বার্ধক্যে তার জন্যেও তেমনি সম্মানকারী নিয়োগ করেন।

০ মায়ের পায়ের তলায় বেহেশ্‌ত। তাঁকে কষ্ট দিও না।

০ যে এক আল্লাহ্ ও পরলোকে বিশ্বাসী, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

০ আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় শত্রু তারা, যারা ইসলাম গ্রহণ করেও অবিশ্বাসীর কাজ করে এবং অযথা রক্তপাত করে।

০ সবচেয়ে বড় অপরাধগুলি হচ্ছে– কাউকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করা, বাপ-মাকে কষ্ট দেওয়া, নরহত্যা, আত্মহত্যা এবং মিথ্যা শপথ করা।

০ জ্ঞানের সন্ধান করো– শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

০ যে মানুষের প্রতি সদয় নয়, আল্লাহ্‌ও তার প্রতি সদয় নন।

০ যে নিজের জন্যে যা কাম্য মনে করে– অথচ অন্যের জন্যেও তা কাম্য মনে করে না– সে ঈমানদার নয়।

০ ক্ষুধিতকে খাবার দাও– পীড়িতকে দেখতে যাও– মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে নির্যাতিতকে সাহায্য করো।

০ যার হাত ও জবান থেকে মানব জাতি নিরাপদ, তিনিই খাঁটি মুসলমান।

০ পিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের সর্বোত্তম উপায় পিতার পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করা।

০ বিদ্যান্বেষণ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ।

০ সংযমের মত পবিত্রতা নেই, সৎ স্বভাবের মত ধন নেই।

০ প্রচুর ধন-সম্পত্তির ভিতর সুখ নেই– মনের সুখই প্রকৃত সুখ।

০ যে পরনিন্দা শ্রবণ করে,– সে পরনিন্দুকদের অন্যতম।

০ যে ব্যক্তি লোকের নিকট কৃতজ্ঞ নয়,– সে আল্লাহ্‌র নিকটও কৃতজ্ঞ নয়।

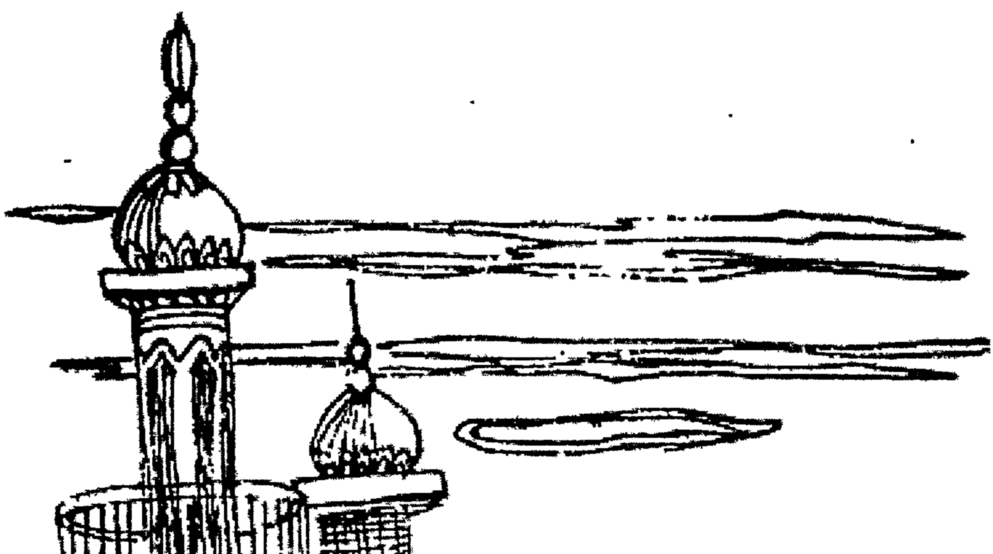
০ মিতব্যয় জীবিকার অর্ধেক, লোকজনকে ভালোবাসা জ্ঞানের অর্ধেক এবং উত্তম প্রশ্ন করা শিক্ষার অর্ধেক।

০ যে ব্যক্তি দুস্থকে সাহায্য করে আল্লাহ্ তার জন্যে ৭৩টি ক্ষমা লিখে রাখেন।

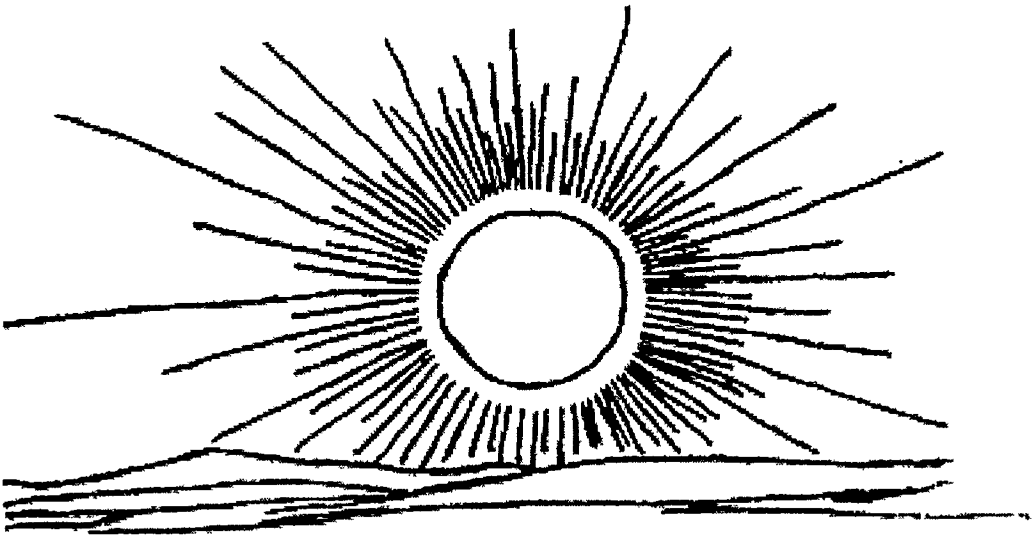
০ যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী তারই পার্শ্বে না খেয়ে থাকে,- সে প্রকৃত মু'মিন নয়।

০ আল্লাহ্ তোমাদের সুন্দর চেহারা বা ধন-দৌলতের দিকে দেখেন না- তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর আর তোমাদের কাজগুলি।

আরো কত শত শত মূল্যবান কথা যে নবীজী বলে গেছেন তার সবগুলো এখানে লেখা সম্ভব নয়। নবীজীর এই পবিত্র বাণীগুলিকেই বলা হয় হাদীস। প্রধান হাদীস গ্রন্থগুলোর নাম হচ্ছে বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাযা। এই হাদীস যাঁরা অমানুষিক পরিশ্রম করে সংকলন করেছিলেন তাঁদের নাম অনুসারে এই সব হাদীস শরীফের নামকরণ হয়েছে। এ গুলো পড়লে আমাদের জীবনের চলাপথে শিক্ষণীয় আরো বহু কিছু জানতে পারা যাবে।



আটত্রিশ



আমাদের প্রিয় নবীজী সম্পর্কে শুধু মুসলমানরাই নয়, দুনিয়ার অন্যান ধর্মের মনীষীরা, বড় বড় পণ্ডিতরাও পড়াশোনা করেছেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক, তাঁর শিক্ষা, তাঁর ধর্ম প্রচার, তাঁর আচার-ব্যবহার, তাঁর পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, যুদ্ধ-নীতি, চুক্তিনামা, বিচার-প্রণালী, শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করে যে সব বক্তব্য পেশ করেছেন– তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে আরো মজবুত করেছে। তোমাদের জানার জন্যে তাঁদের কয়েকজনের মূল্যবান মতামত এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বীর সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন–

'মুহাম্মদ ছিলেন এক রকম রাজা। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে তাঁর চারদিকে সমবেত করেন। তারপর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর অনুসারী মুসলমানগণ পৃথিবীর অর্ধেক জয় করে নেয়। তারা পনেরো বছরে অধিকাংশ আত্মাকে মিথ্যা দেব-দেবীর হাত থেকে ছিনিয়ে আনে, পনেরো শো বছরেও মূসা ও যীশুর অনুসারিগণ যা করতে পারেননি।'

খৃস্টান পাদরী বস্‌ওয়ার্থ স্মিথের মতে–

'ইতিহাসের একটি পরম সৌভাগ্য যে, মুহাম্মদ একাধারে তিনটির প্রতিষ্ঠাতা। একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম।'

টমাস কার্লাইল বলেছেন–

'---মানুষ মুহাম্মদ---একটি আগুনের ফুল্‌কি হিসেবে পড়েছিল পৃথিবীর এমন এক স্থানে, যাকে মনে করা হতো– অযোগ্য কালো বালুকা। কিন্তু সেই বালুকাই বিস্ফোরক বারুদ হিসাবে প্রমাণিত হলো। দিল্লী থেকে গ্রানাডার আসমান পর্যন্ত উঁচু হয়ে সে শিক্ষা বিস্তার করলো। এই মহাপুরুষ যেন

আকাশের বিদ্যুৎ। আর অন্যেরা যেন জ্বালানি কাঠের মত তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল। তারপর তারাও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।'

ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন–

'---সাম্যের দূত মুহাম্মদ। তুমি প্রশ্ন করো, তাঁহার ধর্মে কি ভালো আছে? যদি তাহাতে ভালো না থাকে, তবে কিরূপে সে বাঁচিয়া আছে? কেবল ভালই বাঁচে, কেবল তাহাই টিকিয়া থাকে। ---মুহাম্মদ ছিলেন পয়গম্বর---সাম্যের, মানুষের, ভ্রাতৃত্বের।'

আরো বহু মনীষীর এই ধরনের আরো বহু মন্তব্য আছে আমাদের নবী করীম (সা) সম্পর্কে।

আলোর নবী আল-আমীন দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার আগে আমাদের বলে গেছেন, 'আমি তোমাদের জন্যে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা শক্ত করে ধরে রাখতে পার, তাহলে আর কোনদিন পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো জিনিস হচ্ছে– আল্লাহ্র কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আর তোমাদের রাসূলের সুন্নাত।'

এই দু'টো জিনিসের অভাবেই আজ মুসলিম দুনিয়ায় যত অশান্তি আর হানাহানি। নৈতিকতার অধঃপতন। তাই আবার আমাদের কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির সবক নতুন করে নিতে হবে। আবার আমাদের প্রকৃত মুসলমান, তাঁর খাঁটি উম্মতে পরিণত হতে হবে। এসো– আমরা ছোট-বড় সবাই আজ নবীজীর নামে শপথ নিই– আর আমরা পথভ্রষ্ট হবো না। আপনার রেখে যাওয়া আল্লাহ্র কিতাব আর সুন্নাতকে সামনে রেখে আপনারই নির্দেশিত পথে এবার থেকে আমরা চলবো। দুনিয়াকে আবার আমরা শান্তি-প্রিয় মানুষের বাসযোগ্য করে তুলবো।' আমরা আবার প্রমাণ করব– আমরা সৃষ্টির সেরা, আমরা আল্লাহ্র খলীফা। আমরা শান্তির অনুসারী– আমরা মুসলমান।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে হেদায়েত করুন আর সহজ-সরল সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে চলার তওফীক দিন।

এবার আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে আর একবার সালাম জানাই ঃ

'ইয়া নবী! সালাম আলাইকা!
ইয়া রাসূল! সালাম আলাইকা!
ইয়া হাবীব! সালাম আলাইকা!
সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা!!



ইফাবা—২০০১-২০০২—প্র/৫৪৮৫(উ)—৭,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ